ডিজিটাল প্রযুক্তি

দাখিল

সপ্তম শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

বঙ্গবন্ধু হাইটেক সিটি, কালিয়াকৈর

শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, যশোর

হাইটেক পার্ক আইটি সংক্রান্ত সকল সামগ্রী তৈরি, আমদানি ও রপ্তানি করার সব ধরনের সুবিধা সম্বলিত প্রযুক্তিভিত্তিক শিল্পায়ন। বঙ্গবন্ধু হাইটেক সিটি, শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, জনতা টাওয়ার টেকনোলজি পার্কসহ সারাদেশে বিভিন্ন জেলায় আরও হাইটেক পার্ক নির্মাণাধীন রয়েছে। তরুণদের কর্মসংস্থান এবং হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার শিল্পের উত্তরণ ও বিকাশই হাইটেক পার্ক স্থাপনের উদ্দেশ্য। দেশ-বিদেশের নামকরা শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলো এসব পার্কে তাদের কারখানা প্রতিষ্ঠা করবে। দেশের তরুণরা এসব কারখানায় কাজ করার ও শেখার সুযোগ পাবে। ফলে তারা প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ এবং গবেষণা করে নতুন নতুন শিল্প গড়ে তুলতে পারবে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক জাতীয় শিক্ষাক্রম- ২০২২ অনুযায়ী প্রণীত
এবং ২০২৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে সপ্তম শ্রেণির জন্য নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তক

ডিজিটাল প্রযুক্তি

দাখিল

সপ্তম শ্রেণি

পরীক্ষামূলক সংস্করণ

রচনা

অধ্যাপক ড. এম. তারিক আহসান
অধ্যাপক ড. লাফিফা জামাল
ড. ওমর শেহাব
মির্জা মোহাম্মদ দিদারুল আনাম
আফিয়া সুলতানা
মিশাল ইসলাম
হাসান আল জুবায়ের রনি
ড. মোহাম্মদ কামরুল হক ভূঞা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
কর্তৃক প্রকাশিত

[জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রকাশকাল : ডিসেম্বর ২০২২

শিল্পনির্দেশনা
মঞ্জুর আহমেদ
নাসরীন সুলতানা মিতু

চিত্রণ
অধরা পতত্রী

প্রচ্ছদ
অধরা পতত্রী

গ্রাফিক্স ডিজাইন
নাসরীন সুলতানা মিতু
অধরা পতত্রী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ কথা

পরিবর্তনশীল এই বিশ্বে প্রতিনিয়ত বদলে যাচ্ছে জীবন ও জীবিকা। প্রযুক্তির উৎকর্ষের কারণে পরিবর্তনের গতিও হয়েছে অনেক দ্রুত। দ্রুত পরিবর্তনশীল এই বিশ্বের সঙ্গে আমাদের খাপ খাইয়ে নেওয়ার কোনো বিকল্প নেই। কারণ প্রযুক্তির উন্নয়ন ইতিহাসের যেকোনো সময়ের চেয়ে এগিয়ে চলেছে অভাবনীয় গতিতে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লব পর্যায়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিকাশ আমাদের কর্মসংস্থান এবং জীবনযাপন প্রণালিতে যে পরিবর্তন নিয়ে আসছে তার মধ্য দিয়ে মানুষে মানুষে সম্পর্ক আরও নিবিড় হবে। অদূর ভবিষ্যতে অনেক নতুন কাজের সুযোগ তৈরি হবে যা এখনও আমরা জানি না। অনাগত সেই ভবিষ্যতের সাথে আমরা যেন নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারি তার জন্য এখনই প্রস্তুতি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

পৃথিবী জুড়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটলেও জলবায়ু পরিবর্তন, বায়ুদূষণ, অভিবাসন এবং জাতিগত সহিংসতার মতো সমস্যা আজ অনেক বেশি প্রকট। দেখা দিচ্ছে কোভিড ১৯ এর মতো মহামারি যা সারা বিশ্বের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা এবং অর্থনীতিকে থমকে দিয়েছে। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় সংযোজিত হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাবনা।

এসব চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে তার টেকসই ও কার্যকর সমাধান এবং আমাদের জনমিতিক সুফলকে সম্পদে রূপান্তর করতে হবে। আর এজন্য প্রয়োজন জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন দূরদর্শী, সংবেদনশীল, অভিযোজন-সক্ষম, মানবিক, বৈশ্বিক এবং দেশপ্রেমিক নাগরিক। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পদার্পণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। শিক্ষা হচ্ছে এই লক্ষ্য অর্জনের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। এজন্য শিক্ষার আধুনিকায়ন ছাড়া উপায় নেই। আর এই আধুনিকায়নের উদ্দেশ্যে একটি কার্যকর যুগোপযোগী শিক্ষাক্রম প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের একটি নিয়মিত, কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হলো শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও পরিমার্জন। সর্বশেষ শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা হয় ২০১২ সালে। ইতোমধ্যে অনেক সময় পার হয়ে গিয়েছে। প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও উন্নয়নের। এই উদ্দেশ্যে শিক্ষার বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং শিখন চাহিদা নিরূপণের জন্য ২০১৭ থেকে ২০১৯ সালব্যাপী এনসিটিবির আওতায় বিভিন্ন গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলন পরিচালিত হয়। এসব গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলনের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে নতুন বিশ্ব পরিস্থিতিতে টিকে থাকার মতো যোগ্য প্রজন্ম গড়ে তুলতে প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণির অবিচ্ছিন্ন যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম উন্নয়ন করা হয়েছে।

যোগ্যতাভিত্তিক এ শিক্ষাক্রমের আলোকে সকল ধারার (সাধারণ, মাদ্রাসা ও কারিগরি) ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য এই পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা হলো। বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু এমনভাবে রচনা করা হয়েছে যেন তা অনেক বেশি সহজবোধ্য এবং আনন্দময় হয়। এর মাধ্যমে চারপাশে প্রতিনিয়ত ঘটে চলা বিভিন্ন প্রপঞ্চ ও ঘটনার সাথে পাঠ্যপুস্তকের একটি মেলবন্ধন তৈরি হবে। আশা করা যায় এর মাধ্যমে শিখন হবে অনেক গভীর এবং জীবনব্যাপী।

পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়নে ধর্ম, বর্ণ, সুবিধাবঞ্চিত ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীর বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির বানানরীতি অনুসরণ করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, চিত্রাঙ্কন ও প্রকাশনার কাজে যাঁরা মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

পরীক্ষামূলক এই সংস্করণের কোনো ভুল বা অসংগতি কারো চোখে পড়লে এবং এর মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কোনো পরামর্শ থাকলে তা জানানোর জন্য সকলের প্রতি বিনীত অনুরোধ রইল।

প্রফেসর মোঃ ফরহাদুল ইসলাম

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

শিখন অভিজ্ঞতা ১ — ডিজিটাল সময়ের তথ্য ০১

শিখন অভিজ্ঞতা ২ — বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের ব্যবহার ৩১

শিখন অভিজ্ঞতা ৩ — তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে ভার্চুয়াল পরিচিতি তৈরী ৪৯

শিখন অভিজ্ঞতা ৪ — সাইবার গোয়েন্দাগিরি ৬২

শিখন অভিজ্ঞতা ৫ — আমি যদি হই রোবট ৭২

সূচিপত্র

শিখন অভিজ্ঞতা ৬ বন্ধু নেটওয়ার্কে ভাব বিনিময় ৯৬

শিখন অভিজ্ঞতা ৭ গ্রাহক সেবায় ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার ১০৮

শিখন অভিজ্ঞতা ৮ যোগাযোগে নিয়ম মানি ১২৪

শিখন অভিজ্ঞতা ৯ আঞ্চলিক বৈচিত্র্যপত্র ১৪০

শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে কথা

প্রিয় শিক্ষার্থী, তোমাকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা।

নতুন শিক্ষাক্রমের মাধ্যমে তোমাদের শিক্ষাজীবন শুরু হতে যাচ্ছে। এই শিক্ষাক্রমের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীদের হাতেকলমে কাজ করা ও অভিজ্ঞতা অর্জনের মাধ্যমে শিক্ষাকে আরো বেশি আনন্দঘন ও ফলপ্রসু করা। এখন তোমার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হবে তোমার বেড়ে উঠার এবং নিজেকে আরো বিকশিত করার সামাজিক কেন্দ্র। তোমরা এখন শুধুমাত্র এই বই থেকে শিখবে না, বরং এই বই থেকে নির্দেশনা নিয়ে তোমার আশেপাশের পরিবেশ, মানুষ এবং প্রযুক্তি থেকেও শিখবে।

প্রযুক্তির উন্নয়ন আমাদের এমন একটি জায়গায় এনে দাঁড় করিয়েছে যে, প্রতিদিনই নতুন নতুন জ্ঞান যুক্ত হচ্ছে। আমাদের প্রতিদিনের জীবনও পরিবর্তন হচ্ছে খুব দ্রুত। তাই আজ যেটি আমি মুখস্থ করলাম তা আর কয়েকবছর পর কাজে নাও লাগতে পারে। সুতরাং আমাদের শেখার প্রক্রিয়াও হতে হবে আধুনিক। কোন নোটবই দেখে মুখস্থ করে নয় বরং আশেপাশের পরিবেশকে আরও গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে হাতের কাছে যা প্রযুক্তি আছে তাকে কাজে লাগিয়ে আমাদের প্রতিনিয়ত সমৃদ্ধ হতে হবে। আর এই বই তারই সুযোগ করে দিয়েছে।

ডিজিটাল প্রযুক্তি এখন আর কম্পিউটার চালানোর মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, আমাদের জীবনের সাথে সম্পর্কিত সকল ধরণের সমস্যার প্রযুক্তিগত সমাধান ডিজিটাল প্রযুক্তির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। আমরা শুধু প্রযুক্তি ব্যবহার করা শিখবো তা কিন্তু নয়। প্রযুক্তি ব্যবহার করে আমরা সমস্যার সমাধান করবো ও সাথে সাথে সমস্যা সমাধানের জন্য নতুন প্রযুক্তিও আবিষ্কার করতে শিখবো। এই বই আমাদের সে আবিষ্কারক হওয়ার পথে সহায়ক বন্ধু হিসেবে কাজ করবে।

বইয়ে বিভিন্ন অভিজ্ঞতা এমনভাবে সাজানো হয়েছে যে, হাতের কাছে যদি কোন প্রযুক্তি নাও থাকে তারপরও তোমরা কীভাবে সমস্যা সমাধানে প্রযুক্তিগত সুবিধা কাজে লাগাতে পারো তা হাতে কলমে শিখতে পারবে। আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হল, তোমরা এখন নিজের বন্ধুদের সাথে বা পাশের বিদ্যালয়ের বন্ধুদের সাথে প্রতিযোগিতা করবে না। তোমরা সহযোগিতার মাধ্যমে সবাই একসাথে বিশ্বনাগরিক হয়ে বড় হবে।

তোমার জন্য শুভকামনা !

শিখন অভিজ্ঞতা ১

ডিজিটাল সময়ের তথ্য

সেশন ১ ছয়টি প্রশ্নের উত্তর খুঁজি

আচ্ছা, ছোটদের জীবনে বেশি সমস্যা নাকি বড়দের? আসলে ছোট বড় সবারই প্রতিদিন নানান রকম ঝামেলায় পড়তে হয়, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বড়রাই বড় সমস্যাগুলো আমাদের সমাধান করে দেন। কেমন হবে যদি আমরা ছোটরাও বড় বড় সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করি? বর্তমান সময়ে ডিজিটাল প্রযুক্তির সুবিধা নিয়ে আমরা কিন্তু শুধু তথ্যের মাধ্যমে অনেক সমস্যার সমাধান করে ফেলতে পারি। ষষ্ঠ শ্রেণিতে আমরা তথ্য এবং এর উৎস সম্পর্কে জেনেছি। সপ্তম শ্রেণিতে আমরা তথ্যের মাধ্যমে সুবিধা নেওয়ার জন্য তথ্যকে আরও গভীরভাবে জানার চেষ্টা করব।

তার আগে চল আমরা একটি গল্প পড়ি-

শিশিরের বাবা শিশিরের জন্য নতুন জুতা কিনে এনেছে না। শিশির ও তার ছোট বোন তৃণা বাবা-মায়ের সঙ্গে কাল শ্রীমঙ্গল বেড়াতে যাবে। অনেক দিন পর এত দূরে কোথাও বেড়াতে যাবে বলে শিশির অনেক খুশি, এর মধ্যে আবার সে উপহার পেয়েছে সুন্দর জলপাই রঙের জুতা। কাল সকালে খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠতে হবে ভাবতে ভাবতেই শিশির তার নতুন জুতা জোড়া পায়ে পরেই বিছানায় ঘুমিয়ে পড়ল। গভীর রাতে হঠাৎ শিশিরের ঘুম ভেঙে গেলো ইঁদুরের কিচকিচ শব্দে। শিশির ঘুম থেকে উঠে দেখতে পেল তার পড়ার রুমে যে ইঁদুরটি হঠাৎ হঠাৎ এক দৌড়ে এদিক থেকে ওদিক দৌড়াতে থাকে, সে ইঁদুরটি বিছানায় এসে শিশিরের নতুন জুতার সামনে চুপচাপ বসে আছে !

শিশির এই ইঁদুরের নাম দিয়েছিলো ‘ধূমকেতু’। ধূমকেতুকে গত এক সপ্তাহে শিশির একবারও দেখেনি, এতদিন পর ধূমকেতু এসে একেবারে ওর বিছানায় উঠে বসেছে ! শিশির বিরক্ত হলো খুব! একটু পর শিশিরকে অবাক করে দিয়ে ধূমকেতু বলে উঠল ‘ও শ্রীমঙ্গল যাচ্ছ তোমরা তাহলে?’ শিশির একটু ভয় পেয়ে পা গুটিয়ে নিল কাথার নিচে। ধূমকেতু এখন ওভাবেই বসে আছে। এবার শিশিরের বিস্ময় গিয়ে পৌঁছাল সপ্তম আকাশে, যখন কাথার ভেতর থেকে নতুন জুতা বলে উঠল ‘হ্যাঁ হ্যাঁ, যাবে নাকি সঙ্গে? গেলে চল, শিশির তোমাকে তার পানির ফ্লাস্কে করে লুকিয়ে নিতে পারবে চাইলে, কী বল শিশির,পারবে না?’ ভয়ে শিশিরের মুখ দিয়ে কোনো কথা বের হচ্ছিলনা, অনঘ পা ঝাড়া দিয়ে কোনোরকমে জুতা জোড়া খুলে নিতে চাইলো...

এবার আমরা এই গল্প থেকে কিছু জিনিস বের করার চেষ্টা করব। প্রতিটি গল্প, ঘটনায় বা তথ্যে ৬টি মৌলিক বিষয় থাকে, এটিকে বলে ৬ক বা **5W1H** - কে, কী, কোথায়, কখন, কেন, কীভাবে এই ছয়টি প্রশ্নের উত্তর এই গল্পে আছে কি না, আমরা খুঁজে বের করব। একটি করে উদাহরণ দেওয়া হলো, বাকিগুলো আমরা গল্প থেকে খুঁজে বের করব।

কে ?	১. শিশির	২.	৩.
কী?	১. ঘুমিয়ে পড়ল	২.	৩.
কখন?	১. রাতে	২.	৩.
কোথায়?	১. বিছানায়	২.	৩.
কেন?	১. সকালে উঠতে হবে	২.	৩.
কীভাবে ?	১. জুতা পড়ে	২.	৩.

যে কোনো তথ্য উপস্থাপন করার সময় এই ছয়টি প্রশ্নের উত্তর যখন আমরা একসঙ্গে তুলে ধরতে পারব তখন ঐ বিষয় সম্পর্কে পরিপূর্ণ বা পূর্ণাঙ্গ ধারণা পাওয়া যাবে। তথ্যপ্রযুক্তির প্রসারের ফলে আমরা আগের চেয়ে অনেক বেশি তথ্য প্রতি মুহূর্তে পেতে থাকি, এর কিছু কিছু তথ্য সব সময় সত্য হয় না। ভুলবশত আমরা যদি কোনো মিথ্যা তথ্য বিশ্বাস করে ফেলি তাহলে ছোট-বড় অনেক ধরনের সমস্যা হতে পারে, তাই যে কোনো তথ্য বিশ্বাস করা এবং সেই তথ্য অন্য একজনকে দেওয়ার আগে আমাদের নিশ্চিত হতে হবে, তথ্যটি সঠিক। আর তথ্যটি সঠিক কি না, এটি বোঝার জন্য এই ৬ক খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আবার আমরা যখন অন্য কাউকে তথ্য দেব, তখন লক্ষ্য রাখবো, আমার তথ্যের মধ্যে এই ৬ক এর উত্তর আছে কি না।

আগামী সেশনের প্রস্তুতি:

নিচের ছয়টি বৃত্তের প্রতিটির মাঝখানে তুমি কলম রাখবে, এরপর তোমার বন্ধু তোমার বইটি ঘোরাবে। তুমি যে কোনো একদিকে কলম নেবে। এভাবে ছয়টি বৃত্ত থেকে ছয়টি শব্দ বা বাক্যাংশ বের হবে। এই ছয়টি শব্দ বা বাক্যাংশ দিয়ে তুমি 'শিশির ও তার জুতা' গল্পটি নিজের ইচ্ছেমতো বাকি অংশ লিখবে। শুধু লক্ষ্য রাখবে এই শব্দ বা বাক্যাংশগুলো যেন তোমার গল্পে থাকে । একইভাবে তুমিও তোমার পাশের বন্ধুকে তার ছয়টি শব্দ বের করতে সাহায্য করো।

উপরের ছয়টি বৃত্ত থেকে আমি যে ছয়টি শব্দ বা বাক্যাংশ পেয়েছি, তা নিচের ঘরে লিখব—

কে ?	কোথায়?
কী?	কেন?
কখন?	কীভাবে ?

ভয়ে শিশিরের মুখ দিয়ে কোনো কথা বের হচ্ছিলনা, শিশির পা ঝাড়া দিয়ে কোনোরকমে জুতা জোড়া খুলে নিতে চাইলো...

....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

**এই পৃষ্ঠায় পুরো গল্প জায়গা না হলে একটি আলাদা কাগজে গল্পটি লিখে ওই কাগজের যেকোনো এক পাশে আঠা দিয়ে এই পৃষ্ঠার একপাশে আমরা যুক্ত করে দিতে পারি।

সেশন ২ - উপস্থিত বক্তৃতার মাধ্যমে সমস্যা নির্ধারণ

গল্প লেখার মাধ্যমে আমাদের জানা হয়ে গেল কীভাবে ৬ক এর মাধ্যমে একটি তথ্য, গল্প বা ঘটনাকে পূর্ণাঙ্গভাবে উপস্থাপন করা যায়। আমাদের আগামীর জীবন হবে অনেক তথ্যনির্ভর। তাই তথ্যকে সঠিকভাবে বুঝতে পারা এবং উপস্থাপন করতে পারা খুবই জরুরি। আজকে আমরা ৬ক এর মাধ্যমে কোনো একটি সমস্যাকে পূর্ণাঙ্গরূপে উপস্থিত বক্তৃতার মাধ্যমে তুলে ধরব।

দল গঠন: শ্রেণিকক্ষে আমরা দশটি দলে বিভক্ত হয়ে যাব। দশটি দল দশটি আলাদা বিষয় নিয়ে বক্তৃতা প্রস্তুত করব, দলের যেকোনো একজন বক্তৃতা শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করব।

বিষয় নির্বাচন: শিক্ষক আমাদের দশটি দলকে সাম্প্রতিক সময়ের দশটি বিষয় দিয়ে দেবেন, শিক্ষকের দেওয়া বিষয়টি আমরা দলে আলোচনা করে একটি বক্তব্য তৈরি করব। শিক্ষকের দেওয়া বিষয়ের বাইরে আমাদের নিজেস্ব কোনো পছন্দের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় থাকলে সেটিও আমরা শিক্ষকের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে আমাদের বক্তৃতার বিষয় হিসেবে নিতে পারি।

বক্তৃতার পাণ্ডুলিপি তৈরি: আমাদের দল বক্তৃতার বিষয় হিসেবে যে সমস্যাটি নিয়েছি, সেটি উপস্থাপনের জন্য দলের সবার মতামত ও আলোচনার ভিত্তিতে আমরা একটি পাণ্ডুলিপি বা স্ক্রিপ্ট তৈরি করব। আমাদের মনে রাখতে হবে, সমস্যাটি সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ একটি চিত্র যেন আমাদের বক্তৃতায় তুলে ধরতে পারি, এ ক্ষেত্রে আমাদের পাণ্ডুলিপিতে ৬ক এর উত্তর পাওয়া যায় কি না, তা একটু যাচাই করে নেব।

উপস্থিত বক্তৃতা শেষে দল গঠন ও সমস্যা চিহ্নিত: আমরা আমাদের আশপাশের সাম্প্রতিক কোনো সমস্যা নির্বাচন করে সে সমস্যার 'কারণ' এবং 'কোনো আচরণ পরিবর্তন' করে সেই সমস্যা সমাধান করা যায়, তা তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে খুঁজে বের করব। কাজটি দলীয়ভাবে করতে হবে।

অর্থাৎ আমাদের কাজ তিনটি –

☑ একটি সাম্প্রতিক সমস্যা নির্ধারণ;

☑ তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে 'সেই সমস্যাটি কেন হয়' তার কারণ খুঁজে বের করা;

☑ আমাদের আচরণের মধ্যে কি পরিবর্তন আনলে সে সমস্যাটি সমাধান করা সম্ভব, তা খুঁজে বের করা।

আমরা দুটি পদ্ধতিতে তথ্য খুঁজে বের করব,–

☑ জরিপের মাধ্যমে আশপাশের বন্ধু, বড় ভাইবোন, অভিভাবক, শিক্ষক বিভিন্ন মানুষের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ;

☑ পত্রিকা, টেলিভিশন, রেডিও, ইন্টারনেট বা অন্যান্য মাধ্যম থেকে তথ্য সংগ্রহ।

সুতরাং আমাদের এমন সমস্যা চিহ্নিত করতে হবে, যেটি সম্পর্কে আশপাশের মানুষের জানা থাকবে এবং বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমেও এই সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যাবে। আমরা আমাদের উপস্থিত বক্তৃতার বিষয়গুলো থেকেও আমাদের বিষয় নির্বাচন করতে পারি।

বিষয় নির্বাচন:

আমাদের দলের নাম	
আমরা যে বিষয়টি নিয়ে কাজ করব	
আমার দলের সদস্যদের নাম	

সেশন ৩ - জরিপের মাধ্যমে সমস্যার পেছনের কারণ ও সমাধান অনুসন্ধান

আমরা আমাদের নির্ধারণ করা সমস্যাটির পেছনের কারণ খুঁজে বের করে এর সঠিক সমাধান কী হতে পারে সেটিও বের করার চেষ্টা করব। আমরা যে সমাধানটি পাব, সে সমাধানটি সবাইকে জানানোর জন্য একটি সচেতনতামূলক কনটেন্ট তৈরি করব এবং সেমিনারে উপস্থাপন করব। সবার আগে আমাদের একটু বুঝে নিতে হবে, জরিপ ব্যাপারটি কী!

মনে করি, আমি একটি সমস্যা নিয়ে অনুসন্ধান বা তথ্য সংগ্রহ করতে চাই, আমার সমস্যাটি হলো– 'মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে বই পড়ার অভ্যাস কমেছে, নাকি বেড়েছে তা অনুসন্ধান'। এখন আমি অনুসন্ধান করতে চাই বা খুঁজে বের করতে চাই শিক্ষার্থীদের মধ্যে বই পড়ার অভ্যাস কমে যাওয়া বা বেড়ে যাওয়ার কারণ কী'। এটি খুঁজে বের করার জন্য একটি পদ্ধতি হতে পারে জরিপ। আমি মাধ্যমিকের শিক্ষার্থী, তাদের অভিভাবক এবং তাদের শিক্ষকদের প্রশ্ন করে এর কারণ খুঁজে বের করতে পারি।

অর্থাৎ, কোনো একটি নির্দিষ্ট সমস্যা সম্পর্কে সে সমস্যাটির সঙ্গে পরিচিত/সম্পর্কিত ব্যক্তিদের মতামত, দৃষ্টিভঙ্গি, আচরণ ইত্যাদি কিছু ধারাবাহিক প্রশ্নের মাধ্যমে খুঁজে বের করার কৌশল বা পদ্ধতি হলো জরিপ।

জরিপের প্রশ্নের ধরন

জরিপের প্রশ্নের ধরন বিভিন্ন রকম হতে পারে, আমরা মূলত দুই ধরন সম্পর্কে জানব এবং আমাদের নির্ধারিত সমস্যাটির কারণ এবং সমাধান অনুসন্ধানের জন্য এই দুই ধরনের প্রশ্নের মাধ্যমে একটি জরিপ প্রশ্নপত্র তৈরি করব-

১. বর্ণনামূলক

২. বহুনির্বাচনী

চলো আমরা উদাহরণের মাধ্যমে জরিপের প্রশ্নের ধরনগুলো আরও বিস্তারিত বোঝার চেষ্টা করি।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন -

প্রশ্ন: মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের বই পড়ায় আগ্রহী করতে কী করা উচিত বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর ....

....

নৈর্ব্যক্তিক/ বহুনির্বাচনী প্রশ্ন-

প্রশ্ন: আপনি কি পাঠ্যপুস্তক ব্যতিত নিয়মিত অন্য কোনো বই (গল্পের বা অন্যান্য) বই পড়েন ?

ক. হ্যাঁ খ. না গ. মাঝে মাঝে

লক্ষ্য রাখব আমরা সমস্যাটির যে সমাধান খুঁজছি, তা হলো আমাদের আচরণের পরিবর্তনের সমাধান। যেমন: সমস্যা যদি হয় 'পানি অপচয়' আমার সমাধান হয়তো এ রকম হতে পারে, 'দাঁত ব্রাশ করার সময় পানির কল বন্ধ রাখতে হবে'। অথবা সমস্যা যদি হয় 'বৃক্ষ নিধন' তাহলে সমাধান হতে পারে, 'প্রতিটি শিশু জন্মালে তার নামে পাঁচটি করে গাছ লাগানো'। অর্থ্যাৎ আমরা এমন সমস্যা নির্ধারণ করব যা আমাদের আচরণের পরিবর্তনের মাধ্যমে সমাধান করা সম্ভব।

আমার দলের নির্ধারিত সমস্যার কারণ অনুসন্ধান ও সমাধান খুঁজতে নিজেদের জন্য জরিপের প্রশ্ন তৈরি করি —

এবার আমরা উপরের দুই ধরনের প্রশ্নের পদ্ধতি মাথায় রেখে দলের সবাই মিলে নিজেদের জরিপের জন্য কমপক্ষে দশটি প্রশ্ন তৈরি করব। জরিপের প্রশ্ন তৈরি হয়ে গেলে নিচের ঘরে প্রশ্নগুলো লিখে নিতে পারি, অতিরিক্ত কাগজের দরকার হলে কিছু প্রশ্ন খাতায় লিখে এই বইয়ের সমান করে কেটে এখানে কাগজটি আঠা বা পিন দিয়ে যুক্ত করে দেব।

১।

২।

৩।

৪।

৫।

৬।

৭।

৮।

৯।

১০।

প্রশ্ন তৈরি হয়ে গেলে আমরা এই জরিপ প্রশ্নপত্রটি অনলাইন জরিপ ফর্মের রূপে অনলাইন জরিপে রূপান্তর করব। ইন্টারনেটে বেশ কিছু জরিপ ওয়েবসাইট এবং অ্যাপলিকেশন রয়েছে, যেগুলো আমরা ব্যবহার করতে পারব। দলের সবাই মিলে বিদ্যালয়ের কম্পিউটার ব্যবহার করে শিক্ষকের সহায়তায় এই কাজটি করতে পা্রি। ফর্ম বানানো হয়ে গেলে ২০ জনকে এই ফর্মটি পূরণ করার জন্য পাঠাব। এই ২০ জন হবে আমার নির্ধারিত সমস্যাটির সাঙ্গে সম্পর্কিত ব্যক্তি।

কোনো দলের যদি বিদ্যালয় বা বাড়িতে কোথাও ইন্টারনেট না থাকে, সেক্ষেত্রে তারা কাগজে সুন্দর করে গুছিয়ে ফর্মটি হাতে লিখবে। আমরা যেহেতু এই জরিপ ২০ জনকে পাঠাব, তাই ফর্মটির ২০টি অনুলিপির প্রয়োজন হবে। তাই আমরা দলের সবাই কাজটি ভাগ করে নেব।

অনলাইন জরিপটি তৈরি করার জন্য যে যে ফ্রি টুলস ব্যবহার করা যেতে পারে, তার কয়েকটি নিচে দেওয়া হলো—

১. গুগল ফর্ম

(Google Form)

২. সার্ভেমাঙ্কি

(Survey Monkey)

৩. মাইক্রোসফট ফর্ম

(Microsoft Form)

অনলাইন জরিপ ফর্ম যেমন হয়ে থাকেঃ

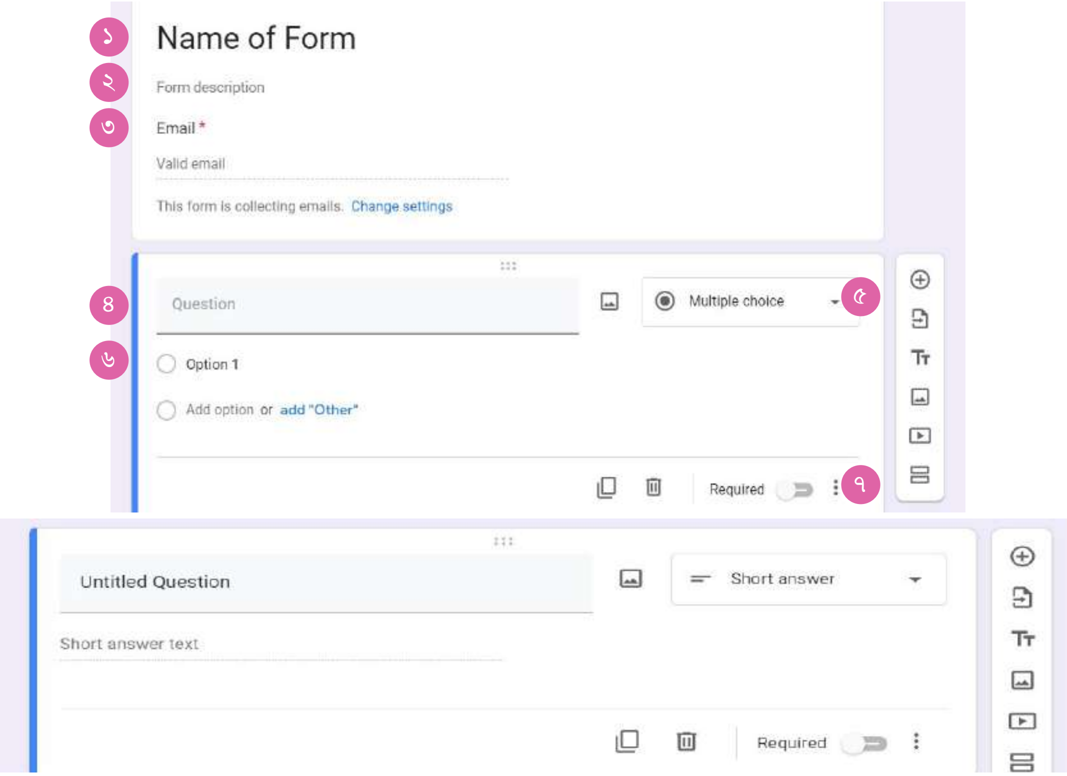

১. 'Name of Form' এর উপর ক্লিক করলে আমি আমার ফর্ম-এর শিরোনাম দিতে পারব।

২. 'Form Description' এ আমার এই জরিপটি কি নিয়ে তা সংক্ষেপে লিখব।

৩. 'Email' এ আমার নিজের বা অভিভাবকের বা শিক্ষকের ইমেইল ঠিকানা দিব, এই ইমেইলেই পুরনকৃত ফর্মগুলো জমা হবে।

৪. 'Untitled Question' ক্লিক করে আমি আমার প্রশ্নটি এখানে লিখব। কোন কোন ফর্ম এ '+' এ রকম যোগ চিহ্ন থাকে, সেখানে ক্লিক করেও একটি একটি করে প্রশ্ন লেখা যাবে।

৫. এরকম ∇ ত্রিভূজটার মধ্যে ক্লিক করে আমরা নির্দেশনা দিয়ে দিতে পারব আমার প্রশ্নটি কী ধরনের। এটি 'নৈর্ব্যক্তিক বা Multiple Choice' নাকি 'বর্ণনামূলক প্রশ্ন বা Short answer'

৬. নৈর্ব্যক্তিক ধরনের প্রশ্ন হলে আমার সম্ভাব্য উত্তর বা option দিয়ে দিতে হবে. একটি option লিখে Enter চাপলেই আরেকটি উত্তর লেখার জায়গা হয়ে যাবে।

৭. 'Required' অর্থ হচ্ছে, এই প্রশ্নের উত্তর আমার অবশ্যই প্রয়োজন। এ ছাড়া '*' স্টার চিহ্ন দিয়েও একই ব্যাপার বোঝানো হয়।

৮. ফর্ম সম্পূর্ণ তৈরি করা হয়ে গেলে 'Send' এ ক্লিক করে আমি যাদের কাছে তথ্য জানতে চাই, তাদের এটি পাঠাব। এটি পাঠাতে তাদের ইমেইল ঠিকানা আমার প্রয়োজন হবে।

সেশন ৪ - আমাদের নির্ধারিত সমস্যার কারণ ও সমাধান কি অন্য কোথাও থাকতে পারে

আমরা ষষ্ঠ শ্রেণিতে জেনেছিলাম, তথ্যের উৎস প্রধানত দুই ধরনের, মানবীয় ও জড় উৎস। মানবীয় (ব্যক্তির কাছ থেকে পাওয়া তথ্য) উৎস থেকে আমাদের তথ্য সংগ্রহ চলছে। তোমরা নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে অনলাইন ফর্ম তৈরি করে ২০ জনকে পাঠিয়ে দিয়েছ, অথবা হাতে লিখে ২০ জনের কাছ থকে জরিপের প্রশ্ন পূরণ করা চলছে। এবার আমরা জড় উৎস থেকে আমাদের সমস্যা সম্পর্কিত কোনো তথ্য পাওয়া যায় কি না, খুঁজে দেখব।

যেসব জড় মাধ্যম থেকে সবচেয়ে বেশি নির্ভরযোগ্য (যথার্থ) তথ্য পাওয়া যেতে পারে, তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে গণমাধ্যম। ‘গণমাধ্যম’ শব্দটি নিশচয়ই আমরা আগেও শুনেছি, তাই না? প্রচারের ধরনভেদে গণমাধ্যমের আবার বিভিন্ন ভাগ রয়েছে—

১. মুদ্রণ মাধ্যম – পত্রিকা, ম্যাগাজিন, বই ইত্যাদি

২. ইলেকট্রনিক মাধ্যম – রেডিও, টেলিভিশন ইত্যাদি

৩. ইন্টারনেট বা নিউ মিডিয়া – ওয়েবসাইট, অনলাইন পত্রিকা, অনলাইন টেলিভিশন ইত্যাদি।

আজকে আমরা একটি খেলা খেললে কেমন হয় বলতো ! উপরে তিন ধরনের যে গণমাধ্যমের নাম দেখতে পাচ্ছি, সেগুলোর নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। আমাদের শিক্ষক এক বাক্যে একটি করে বৈশিষ্ট্য বলবেন আর একটি বল আমাদের যেকোনো একজনের দিকে ছুড়ে মারবেন, যার দিকে বলটি মারা হলো সে বলটি নিয়েই শিক্ষক কোনো মাধ্যমটির বৈশিষ্ট্য বলছেন, তার নাম বলব। আমরা সবাই দাঁড়িয়ে খেলাটি খেলব। উত্তর সঠিক হলে বসে পড়ব, ভুল হলে দাঁড়িয়ে থাকব এবং বলটি আবার শিক্ষকের কাছে ফেরত দেব।

আমরা এবার আমাদের সমস্যাটি সম্পর্কে কোনো মাধ্যমে কোনো তথ্য আছে কি না, তা খুঁজে বের করার চেষ্টা করব। আমাদের সমস্যা সম্পর্কে তথ্য খুঁজতে আমরা উপরের যেকোনো এক বা দুই ধরনের মাধ্যম ব্যবহার করতে পারি। শিক্ষক আমাদের কোনো পত্রিকা, কিংবা বই দেবেন সেখান থেকে আমরা আমাদের নির্ধারিত সমস্যা সম্পর্কে কিছু খুঁজে পাই কি না, দেখব। শিক্ষক আমাদের ইন্টারনেটের মাধ্যমেও খুঁজতে সহায়তা করতে পারেন। এ ক্ষেত্রে আমরা শিক্ষককে বলে দেব আমাদের সমস্যাটি খুঁজতে কী কী মূল শব্দ (Key Word) দিয়ে খুঁজতে হবে (সার্চ দিতে হবে)।

কোনো বিদ্যালয়ে যদি পত্রিকা, ম্যাগাজিন, বই, রেডিও, টেলিভিশন, ইন্টারনেট এমন কিছু না থাকে, তাহলে আমরা আমাদের শ্রেণির কিংবা অন্য কোনো শ্রেণির অন্য কোনো বই যেমন – ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান, বিজ্ঞান, জীবন ও জীবিকা, শিল্প ও সংস্কৃতি, বাংলা যে কোনো বইয়ে আমাদের সমস্যা সম্পর্কে কোনো তথ্য আছে কি না, খুঁজে বের করার চেষ্টা করব।

জড় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে আমরা কিছু ব্যাপার লক্ষ্য রাখব –

১. তথ্যটি কত তারিখে প্রচার হয়েছে। (কারণ, সময়ের ব্যবধানে আজকের আপাত দৃষ্টিতে কোনো সত্য তথ্য আগামীকাল অসত্য প্রমাণ হয়ে যেতে পারে। যেমন: বাংলাদেশের মোট বিভাগ ৭টি। এটি ২০১৪ সাল পর্যন্ত সঠিক তথ্য হলেও ২০১৫ সালের জন্য এটি সঠিক তথ্য নয়, কারণ ২০১৫ সালে ময়মনসিংহকে নতুনভাবে বিভাগ ঘোষণা করা হয়)

২. যতটা সম্ভব সাম্প্রতিক তথ্য নেওয়ার চেষ্টা করব।

৩. কোনো নিউজের হেডলাইন বা শিরোনাম দেখেই আমরা সিদ্ধান্ত নিয়ে নেব না, পুরো খবর পড়ব।

৪. কোনো মাধ্যমে একটি সংবাদ দেখার পর একই Key Word দিয়ে আবার সার্চ দেব এবং যাচাই করব, অন্য মাধ্যমও একই সংবাদ দিচ্ছে কি না (ইন্টারনেট এর সুবিধা থাকলে)।

৫. পত্রিকা বা টেলিভিশনের লোগো দেখেই বিশ্বাস করে ফেলবনা সংবাদটি ঐ পত্রিকার বা টেলিভিশনের। যাচাই করার জন্য ঐ পত্রিকা বা টেলিভিশনের ওয়েবসাইটে যাব।

৬. আমি যে প্রতিষ্ঠানের তথ্য নিতে চাই, সেই প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে যাব। লক্ষ্য রাখব হাইপারলিংকটি ঠিক আছে কি না। যেমন জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ- এর কোন ইন্টারনেটের মাধ্যমে জানতে চাইলে হাইপারলিংকটি হবে এ রকম - http://www.nctb.gov.bd/। অনেক সময় কেউ যদি জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ- এর নামে কোনো ভুল প্রচারণা করতে চায়, তাহলে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ-এর ওয়েবসাইটের মতো নকল একটি ওয়েবসাইট তারা বানিয়ে রাখতে পারে। সে ক্ষেত্রে হাইপারলিংকটি দেখতে অন্যরকম হতে পারে। সেই লিংকে কোনো একটি/দুটি অক্ষর এলোমেলো থাকবে, যেমন, c এর জায়গায় n, b এর যায়গায় d, o এর জায়গায় i এরকম এলোমেলো করে অক্ষরগুলো থাকবে, যা হয়তো আমাদের সহজে চোখে পড়বে না। তাই তথ্য নেওয়ার আগে লিংকটি ঠিক আছে কি না, তা দেখে নেওয়াটা জরুরি।

আগামী সেশনের প্রস্তুতি

আজকে শ্রেণিকক্ষে আমরা কিছু জড় উৎস থেকে আমার দলের নির্ধারিত বিষয়ের উপর তথ্য খোঁজার চেষ্টা করলাম। বাড়িতে গিয়ে আমরা আরও কিছু জড় উৎস থেকে একই বিষয়ে তথ্য খোঁজার চেষ্টা করব। যে তথ্য পেলাম, তা নিচের ঘরে লিখব। অতিরিক্ত কাগজের দরকার হলে, খাতায় লিখে আমরা এই বইয়ে এই পৃষ্ঠার মাঝখানে আঠা দিয়ে যুক্ত করে দেব।

সেশন ৫ - তথ্য সমন্বয়ের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান চিহ্নিত করা

আমরা মানবীয় ও জড় এই দুই উৎস থেকেই তথ্য সংগ্রহ করেছি। কিন্তু তথ্যগুলো আসলে বিচ্ছিন্ন বা কিছু সংখ্যা এবং বর্ণনা। একটি সিদ্ধান্তে পৌছানোর জন্য এই সংখ্যা বা বর্ণনা যথেষ্ট নয়। তাই আমরা তথ্যগুলোকে বিশ্লেষণ করে এর থেকে মূল তথ্যটি খুঁজে বের করব।

যেমন আমাদের সমস্যটি যদি হয় 'মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে বই পড়ার প্রবণতা/অভ্যাস কমে গেছে' এবং আমার প্রশ্নটি যদি হয় , 'আপনি কি পাঠ্যবইয়ের বাইরে অন্য কোনো বই পড়েন – ক. হ্যাঁ খ. না'। এখন আমাকে বিশ্লেষণ করে বের করতে হবে যে কত শতাংশ উত্তরদাতা 'হ্যাঁ' বলেছে আর কত শতাংশ উত্তরদাতা 'না' বলেছে।

আমরা নিশ্চয়ই ট্যালির অঙ্ক করেছিলাম তাই, না? আমরা এবার ট্যালির মাধ্যমে বের করব কয়জন 'হ্যাঁ' বলেছে এবং কয়জন 'না' বলেছে। এবার এই সংখ্যাকে শতাংশে রূপান্তরিত করব।

উদাহরণ -

প্রশ্ন: আপনি কি পাঠ্যবইয়ের বাইরে অন্য কোনো বই পড়েন – ক. হ্যাঁ খ. না

- 'হ্যাঁ' উত্তর দিয়েছে = ৫ জন
- 'না' উত্তর দিয়েছে = ১৫ জন
- মোট উত্তরদাতা = ২০ জন

'হ্যাঁ' উত্তরকে শতাংশে রূপান্তর = ৫জন × ১০০ ÷ ২০ জন = ২৫%

'না' উত্তরকে শতাংশে রূপান্তর = ১৫ জন × ১০০ ÷ ২০ জন = ৭৫%

তাহলে, আমরা একটি সিদ্ধান্তে আসতে পারলাম, ৭৫% মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থী পাঠ্যবইয়ের বাইরে কোনো বই পড়ে না।

আমরা আজ ২০ জনের হিসাব করছি বলে খুব সহজে ট্যালির মাধ্যমে হাতে গুনে গুনে হিসাবটা বের করে ফেললাম। কিন্তু যদি আমাদের ১০০ বা ১০০০ জনের জরিপের ফলাফল বের করতে হয়? বড় জরিপের ফলাফল বিশ্লেষণ করার জন্য রয়েছে কম্পিউটার সফটওয়্যার বা স্প্রেডশিট ।

কম্পিউটার বা সফটওয়্যারকে আমাদের ভাষা বোঝাতে হয় কোড দিয়ে। ধরি, হ্যাঁ এর কোড হচ্ছে 'ক', না এর কোড হচ্ছে 'খ'। আর ঠিকঠাক ফর্মুলা লিখতে পারলে মুহূর্তে বের হয়ে যাবে কঠিন কঠিন সব হিসাব। এটি কীভাবে কাজ করে তা নিচের টেবিলটি দেখে বোঝার চেষ্টা করি।

বাঁয়ে থেকে ডানে ঘরগুলোকে বলে = রো (Row) বা সারি

উপর থেকে নিচে ঘরগুলোকে বলে = কলাম (Column)

আর কলাম ও রো এর মাধ্যমে যে ছোট ছোট ঘরগুলো তৈরি হয়েছে, এগুলোকে বলে = সেল (Cell)

এখানে নীল রঙের ছোট Cell টার নাম C5,কেন এর নাম C5 হয়েছে বলতে পারো?

উত্তর:...

১	A	B	C	D	E
২	১ম উত্তরদাতা	ক		৫	ক
৩	২য় উত্তরদাতা	খ		১৫	খ
৪	৩য় উত্তরদাতা	খ			
৫	৪র্থ উত্তরদাতা	খ			
৬	৫ম উত্তরদাতা	খ			
৭	৬ষ্ঠ উত্তরদাতা	ক			
৮	৭ম উত্তরদাতা	খ			

Column B তে আমার প্রথম প্রশ্ন থেকে আসা সব উত্তর নিচে নিচে Row তে টাইপ করব আবার Column C তে দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরগুলো লিখব, এভাবে আমার যতগুলো প্রশ্ন থাকবে তার উত্তর পাশাপাশি কলামে লিখব। তারপর সর্বডানের কলাম থেকে আমরা ফর্মুলা লিখব। বিদ্যালয়ে বা হাতের কাছে কম্পিউটার থাকলে আমরা বিভিন্ন ফর্মুলা বসিয়ে অনুশীলন করতে পারি এটি কীভাবে কাজ করে, এতে করে বড় হলে আমাদের কাজ করা সহজ হয়ে যাবে।

এভাবে আমরা আমাদের সবগুলো 'বহুনির্বাচনী'— ধরনের প্রশ্নের উত্তরের শতাংশ বের করে ফেলতে পারব।

বর্ণনামূলক যে প্রশ্ন ছিল, সেগুলোকেও আমরা সমন্বয় করব, কিন্তু সংখ্যায় রূপান্তর করতে পারবনা। তাহলে সেগুলোর সমন্বয় কীভাবে করা সম্ভব! আমরা ঐ প্রশ্নগুলোর সবগুলোর উত্তরের মধ্যে কোনো মিল এবং অমিল খুঁজে পাই কি না, খুঁজে বের করব এবং সে অনুযায়ী একসঙ্গে লিখব। উদাহরণ,

'মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে কেন বই পড়ার অভ্যাস কমে গেছে বলে আপনার মনে হয়?'

এই প্রশ্নের উত্তরে, চারজন উত্তরদাতা বলেছেন, 'গল্পের বই এর দাম বেড়ে যাওয়ায় অনেক শিক্ষার্থী পছন্দের বই কিনতে পারছে না, তাই তাদের বই পড়ার অভ্যাস গড়ে উঠছে না, এইজন্য অনেক বেশি লাইব্রেরি গড়ে ওঠা প্রয়োজন'। অন্যদিকে দুজন উত্তরদাতা বলেছেন, 'বিদ্যালয়ের পড়ার চাপ এত

বেশি, যার কারনে শিক্ষার্থীরা বই পড়ার সময় পায় না' তবে অন্য একজন কিছুটা ভিন্নমত পোষণ করেছেন, তিনি মনে করেন 'ভিডিও গেমসের আসক্তি'র কারণে পড়ার অভ্যাস কমে গেছে,

দলে কাজ করে আমাদের তথ্যগুলো শতাংশে এবং বর্ণনায় সমন্বয় করি এবং জড় মাধ্যম থেকে প্রাপ্ত তথ্যও একইভাবে যুক্ত করব।

আগামী সেশনের প্রস্তুতি

দলীয়ভাবে আমাদের তথ্য সমন্বয় করা শেষ হলে আমরা সবাই নিজের খাতায় প্রাপ্ত তথ্যগুলো লিখে নেব এবং এর উপর ভিত্তি করে আমরা এককভাবে একটি রিপোর্ট তৈরি করব।

রিপোর্ট যেভাবে লেখা যেতে পারে: (টাইপ করে বা হাতে লিখে)

- ভূমিকা
- সমস্যাটি বাছাই এর কারণ
- যেভাবে তথ্য সংগ্রহ করেছি
- যে তথ্য পেয়েছি
- আমরা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি – ১. সমস্যার কারণ ২. সমস্যার সমাধান
- সমাধানটি আমরা যেভাবে কাজে লাগাব।

*** রিপোর্ট তৈরি হয়ে গেলে প্রথমে আমাদের অভিভাবককে পড়ে শোনাব, তারপর আগামী দিন শিক্ষকের কাছে জমা দেব।

সেশন ৬ - তথ্যের সংরক্ষণ

আমাদের রিপোর্ট তৈরির কাজ কি শেষ, নাকি এখনও চলছে? আরেকটু যদি সময় প্রয়োজন হয়, তাহলে নেওয়া যেতে পারে। এর মধ্যে আমরা আজকে আরেকটি নতুন বিষয় নিয়ে বোঝার চেষ্টা করব। সেটি হচ্ছে 'তথ্য সংরক্ষণ'। সংরক্ষণ মানে হচ্ছে 'রক্ষা করা' বা 'জমিয়ে রাখা' তাই না? আচ্ছা অনেক অনেক বছর আগে তথ্য কীভাবে রক্ষা করা হতো আমরা কী পড়েছি ইতিহাসে?

চর্যাপদের ছবি

পাথরে খোদাই করে, গুহায় বিভিন্ন সাংকেতিক ভাষায় লিখে, কিংবা গাছের গুঁড়িতে লিখে।

আমরা বর্তমানে কীভাবে তথ্য সংরক্ষণ করি তুমি কি জানো?

জানলে তোমার উত্তর লেখ –

১। ....

২। ....

৩। ....

আচ্ছা কোনো তথ্য যদি খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়, তখন আমাদের শিক্ষকরা কীভাবে এটিকে সংরক্ষণ করেন?

- কাগজ বা প্লাস্টিকের ফাইল তৈরি করে আলমারিতে রাখেন;
- কম্পিউটারে টাইপ করে কম্পিউটারের হার্ডডিস্কে রাখেন।

আলমারি কিন্তু কোনো কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, কাগজ পোকা কাটতে পারে, কম্পিউটারের হার্ড ডিস্কও নষ্ট হয়ে যেতে পারে, মোবাইল মেমরি কার্ড যেখানে তথ্য জমা থাকে, সেটিও নষ্ট বা হারিয়ে বা চুরি হয়ে যেতে পারে। তাহলে এমন কিছু কি আছে যেখানে তথ্য অনেক বেশি নিরাপদভাবে সংরক্ষণ করা যায়?

হ্যাঁ, এটিকে বলে ক্লাউড!

ক্লাউডের বাংলা হচ্ছে 'মেঘ'! তাহলে কি মেঘের মধ্যে তথ্য থাকে?

আসলে তা নয়, বিশ্বের অনেক বড় বড় ইন্টারনেট সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান আছে, যাদের আছে অনেক বড় বড় ডাটা সেন্টার বা তথ্যকেন্দ্র ! সেখানে প্রতিদিন কোটি কোটি মানুষের সকল তথ্য জমা হতে থাকে। আমরা যখন নিজেদের অনলাইন আইডি খুলব, তখন আমাদের তথ্যও সেখানে জমা হয়ে যাবে, আর আমরা চাইলে আমাদের সেই অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে পৃথিবীর যেখান থেকে ইচ্ছে যেকোনো

বাংলাদেশ ডাটা সেন্টারের ছবি

কম্পিউটার বা মোবাইল ফোনে সেই অ্যাকাউন্ট লগ ইন করে আমার জমিয়ে রাখা তথ্য দেখতে পারব, পরিবর্তন করতে পারব এবং ব্যবহার করতে পারব।

তবে এটিও সত্যি, যদি অন্য কেউ আমার সেই অ্যাকাউন্টের পাসওয়ার্ড জেনে ফেলে, তাহলে আমার অ্যাকাউন্ট সে নিয়ে নিতে পারবে, আর আমার সকল তথ্যও নিয়ে নিতে পারবে! অনেকটা আলমারির চাবি অপ্রত্যাশিত কারও হাতে চলে যাওয়ার মতো!

আচ্ছা, তুমি যদি কোনো অ্যাকাউন্ট খোলো, সবার আগে কোনো তিনটি তথ্য তোমার সেই অ্যাকাউন্টে জমা রাখতে চাও? (তথ্য হতে পারে কোলো লেখা, রিপোর্ট, গান, ছবি, ভিডিও, বিদ্যালয়ের কোনো প্রজেক্ট)—

১।

২।

৩।

এবার ভেবে দেখি তো এই তথ্যগুলো যদি অন্যের হাতে চলে যায় তাহলে আমার কোনো ক্ষতি হতে পারে কি না !

আচ্ছা, আমাদের কি মনে আছে আমরা আমাদের নির্ধারিত সমস্যার সমাধান নিয়ে একটি সেমিনারের আয়োজন করব?

তাহলে আমাদের আজকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে আমরা কোনো সমাধানটি নিয়ে সেমিনারের জন্য সচেতনতামূলক কনটেন্ট তৈরি করব। তথ্যের মাধ্যম আমরা হয়তো অনেক সমাধান পেয়েছি, তবে ওখান থেকে আমরা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমাধানটি নিয়েই কাজ করব।

নিজের দলের সমস্যা ও সমাধানটি এখানে লিখি –

দলের নাম:..

সমস্যা ছিল ....

....।

যে সমাধানটি আমাদের সচেতনতামূলক কার্যক্রমে ব্যবহার করতে চাই:

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....।

সেশন ৭ - সমাধান জানাব সেমিনারে

শৈবাল আজকে বিদ্যালয় আসার সময় দেখল অনেক মেঘ করেছে, ও ক্লাসে এসে তার বন্ধুদের বলল 'জানিস আজকে বৃষ্টি হবে'। শৈবাল তার বন্ধুদের তার চারপাশের পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করে একটি তথ্য দিল। এটি হচ্ছে তার মতামত । একই তথ্য যদি শৈবাল একটি মেঘের ছবি তুলে, সেখানে তার নাম ও তারিখসহ বৃষ্টির পূর্বাভাস লিখে কোনো একটি মাধ্যমে প্রচার করে তার বন্ধুদের জানাত তাহলে আমরা সেই তথ্যটিকে বলতে পারতাম শৈবালের তৈরি 'বিষয়বস্তু বা কনটেন্ট'।

মালা গতকাল মায়ের সঙ্গে বাজারে গিয়েছিল, একটি দোকান থেকে মালা কলম কিনতে গিয়ে দেখল, দুটি কলম কিনলে দোকানি তাকে একটি কলম ফ্রি দিয়েছেন। মালা খুব খুশি হলো আর তার সব বন্ধুদের খবরটি জানিয়ে দিল। মালা তার অভিজ্ঞতা থেকে এই তথ্য তার বন্ধুদের দিল। মালা যদি বাজারে একটি পোস্টারে ওই দোকানের বিজ্ঞাপন দেখত, 'দুটি কলম কিনলে একটি কলম ফ্রি' তাহলে ওই পোস্টারের বিজ্ঞাপনটিকে বলা যেত একটি 'বিষয়বস্তু বা কনটেন্ট'।

কনটেন্ট বা বিষয়বস্তু হলো একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর বিভিন্ন রকম তথ্যের সংকলন (সংযোগ বা একত্র করা) যা বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করে পাঠক বা দর্শকের বোঝার উপযোগী করে তৈরি করা হয়। বইয়ের গল্প, নাটক, সিনেমা, খবর, গান এ সবগুলোই হচ্ছে কনটেন্ট। কনটেন্ট বা বিষয়বস্তু শুধু যে আমাদের তথ্য দেয় তা কিন্তু নয়, এটি আমাদের বিনোদনও দেয়।

আমরা একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারব, আমরা সারা দিন নানান রকম কনটেন্ট আমাদের চারপাশে দেখতে পাই। যেমন গান শুনতে পাই, টেলিভিশন দেখতে পাই, দোকানের মধ্যে অনেক রকম পোস্টার দেখতে পাই। কিন্তু এর মধ্যে ডিজিটাল কনটেন্ট কোনোগুলো? যে কনটেন্টগুলো ইন্টারনেটের মাধ্যমে প্রচার এবং আমাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয় সেগুলো হচ্ছে ডিজিটাল কনটেন্ট।

আমার পাশের বন্ধুর সঙ্গে গল্প করি

আমি গতকাল থেকে আজকে পর্যন্ত কি কি কনটেন্ট দেখেছি তা আমার পাশের বন্ধুর সঙ্গে গল্প করি। এর মধ্যে কোনোটা ডিজিটাল ছিল কিনা সেটিও বন্ধুকে বলব। বলার সময় একটু সুন্দর করে গুছিয়ে বলব, কী দেখেছি? কখন দেখেছি? কীভাবে দেখাছি? কার সঙ্গে দেখেছি? কেন ভালো/মন্দ লেগেছে?

নিচের ঘরে আমার বন্ধু যে যে কনটেন্ট দেখেছে তার যেকোনো তিনটি লিখি। এর মধ্যে কোনোটি ডিজিটাল কনটেন্ট এবং কোনোটি ডিজিটাল নয় তাতে টিক দিই-

আমার বন্ধু যে যে কনটেন্ট দেখেছে	ডিজিটাল	নন ডিজিটাল
১.		
২.		
৩.		

সেমিনার আয়োজন

আমরা গত কিছুদিন দলীয়ভাবে একটি সমস্যা নিয়ে গবেষণা করেছি এবং সমস্যার সমাধানও খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু সে সমাধান শুধু আমার প্রতিবেদনের লেখা হয়ে বন্দী থাকলে কী হবে? সবচেয়ে ভালো হয় আমরা যদি একটি সেমিনার আয়োজন করতে পারি। সেমিনারে আমরা আমাদের সমাধানগুলো বিভিন্নভাবে সবার কাছে উপস্থাপন করব। আমরা বিভিন্ন রকম কনটেন্ট বা বিষয়বস্তুর আকারে এগুলো উপস্থাপন করতে পারি, যেমন –

- কম্পিউটার ব্যবহার করে উপস্থাপনা;
- ছবি দিয়ে গল্প বলা;
- মোবাইল ফোনের ক্যামেরায় তৈরি নাটক;
- ফোনের অ্যানিমেশন ব্যবহার করে গল্প বলা;
- ডিজিটাল পোস্টার তৈরি;

নাটক, ছড়া বা গান বানানো।

আমাদের মনে রাখতে হবে, আমাদের যার যার কাছে যা যা রিসোর্স আছে তাই দিয়েই কনটেন্ট তৈরি করবো। এই কাজ করার জন্য নতুন কোন ডিভাইস (মোবাইল ফোন বা অন্যান্য) অথবা অন্য সামগ্রী কিনে অর্থ ব্যয় করবোনা।

আগামী সেশনের প্রস্তুতি

কেমন হবে আমাদের কনটেন্ট?

আমরা দলের সবাই মিলে চিন্তা করব আমরা কী বা কেমন কনটেন্টের মাধ্যম আমাদের বিদ্যালয়ের সবাইকে সচেতন করতে চাই। নিজে নিজে ভেবে নিয়ে আসব আর পরবর্তী দিন দলের সবাই মিলে ঠিক করব আমরা কোন কাজটি করতে পারি। এ ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, আমাদের হাতের কাছে যে ধরনের প্রযুক্তিগত সুবিধা আছে সেগুলোকে কাজে লাগিয়েই আমরা আমাদের কনটেন্ট তৈরি করব। প্রযুক্তির সুবধা না থাকলে আমরা গান, কবিতা, ছড়া, গল্প বলা, নাটক মঞ্চায়ন ইত্যাদির মাধ্যমেও সচেতন করতে পারি।

প্রস্তুতি নিতে সুবিধার জন্য কিছু তথ্য

একটি বিষয় আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে, আমাদের সমস্যা এবং সমাধান যাদের সঙ্গে সম্পর্কিত, তারা অথবা যাদেরকে আমরা সচেতন করতে চাই, তারা হচ্ছেন আমাদের লক্ষ্য দল বা টার্গেট গ্রুপ। বিষয়টি আমরা ষষ্ঠ শ্রেণিতে জেনেছি। তারপরও আমরা আরেকটু উদাহরণ দিয়ে বোঝার চেষ্টা করতে পারি।

আমার সমস্যাটি যদি হয়—

‘মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে বই পড়ার প্রবণতা বা অভ্যাস কমে গেছে’।

জরিপ ও অন্যান্য মাধ্যম থেকে আমরা যে তথ্য পেয়েছি সেখানে আমাদের সমস্যার প্রধান কারণ হতে পারে তিন রকম—

১. 'ভিডিও গেমসের আসক্তি'র কারণে পড়ার অভ্যাস কমে গেছে';

২. 'বিদ্যালয়ের পড়ার চাপ এত বেশি, যার কারণে শিক্ষার্থীরা বই পড়ার সময় পায় না';

৩. 'গল্পের বইয়ের দাম বেড়ে যাওয়ায় অনেক শিক্ষার্থী পছন্দের বই কিনতে পারছে না'।

তিনটি সমস্যার সমাধান হবে তিন রকম—

১. অভিভাবকের উচিত শিক্ষার্থীদের হাতে নির্দিষ্ট বা অল্প সময়ের জন্য মোবাইল ফোন দেওয়া;

২. শিক্ষকের উচিত শ্রেণিকক্ষেই অধিকাংশ পড়াশোনা শেষ করে ফেলা, যেন শিক্ষার্থীদের অতিরিক্ত কোচিং করতে না হয়;

৩. বিদ্যালয়ের উচিত তাদের লাইব্রেরিতে গল্পের বই রাখা এবং শিক্ষার্থীদের বিনা মূল্যে বা অল্পমূল্যে বই পড়ার সুযোগ করে দেওয়া ।

তিনটি সমাধানের জন্য টার্গেট গ্রুপ হবে ভিন্ন ভিন্ন—

১ নম্বর সমাধানের জন্য টার্গেট গ্রুপ বা লক্ষ্য দল — অভিভাবক

২ নম্বর সমাধানের জন্য টার্গেট গ্রুপ বা লক্ষ্য দল — শিক্ষক

৩ নম্বর সমাধানের জন্য টার্গেট গ্রুপ বা লক্ষ্য দল — বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

তাই আমাদের গল্পগুলো আমরা এমনভাবে সাজাব যেন আমাদের টার্গেট গ্রুপের পছন্দ, বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা এগুলোর ভিন্নতা অনুযায়ী তারা আমাদের গল্পটি পছন্দ করে এবং সচেতন হয়।

সেশন ৮ - সেমিনার আয়োজনে কনটেন্ট তৈরি

আজকের সেশনের শেষের দিকে আমরা আমাদের দলে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেব আমরা কেমন কনটেন্ট বানাতে চাই। যদি আমরা ক্যামেরায় ছবি তুলে গল্প বলতে চাই, কমিকস এঁকে গল্প বলতে চাই বা মোবাইল ফোনের ক্যামেরায় একটি নাটিকা বানাতে চাই, তাহলে কিছু ব্যপার আমাদের জানা থাকলে মন্দ হবেনা। আমি যে গল্প বলতে চাই তা যদি আমরা এঁকে কিংবা ছবিতে প্রকাশ করতে পারি তাহলে সেটি আরও অনেক বেশি মজার হতে পারে। তাই তোমাদের ভাবনার সুবিধার জন্য কিছু কৌশল নিচে দেওয়া হলো-

আমার চোখের ভাষা যদি না বলে বোঝাতে চাই:

আমরা আমাদের গল্পটিকে যেভাবে দেখছি তা আমাদের ছবিতে কীভাবে ফুটিয়ে তুলব তা একটু বুঝে নেওয়া যাক। এগুলো আমাদের মুখস্থ করতে হবে না, একটু বুঝে নিয়ে আমরা যখন ছবি তুলব কিংবা আকব তখন এগুলো কাজে লাগালেই হবে। *শট বলতে বোঝায় আমি আমার চিত্রের কতটুকু অংশে কীভাবে আমার বিষয়টিকে রাখব।

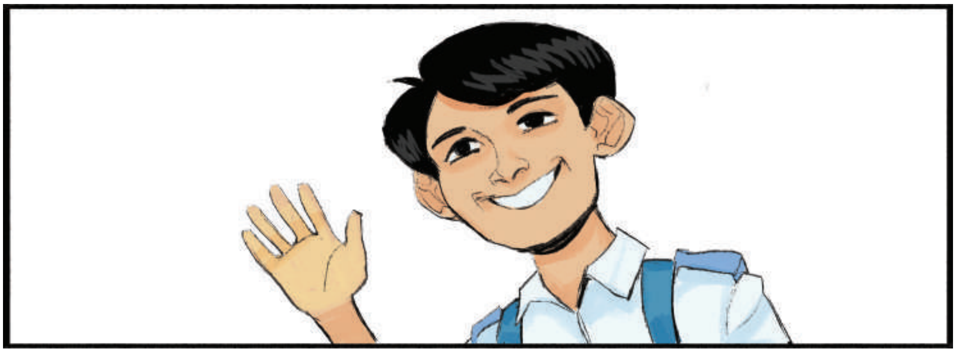

১. দুইজন বন্ধু কথা বলছে, একজন বন্ধু হাসছে, আমি যদি হাসিটা দেখাতে চাই তাহলে একেবারে সামনে থেকে দেখতে হবে, যখন সামনে থেকে ক্যামেরায় ছবিটি তোলা হবে তখন হয়ে যাবে 'ক্লোজ শট'।

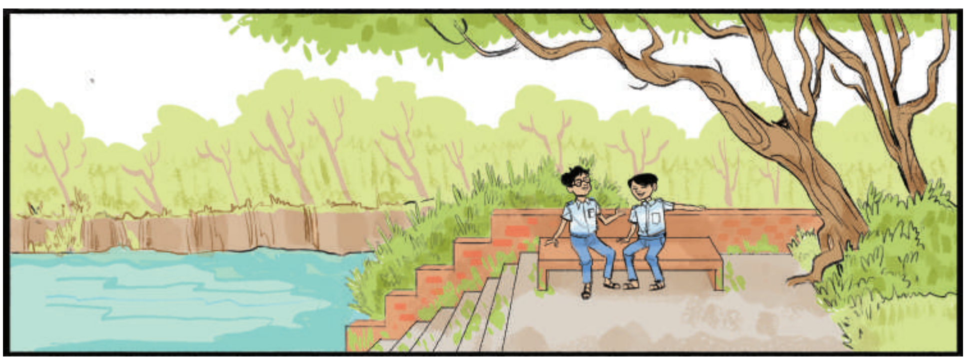

২. দুজন বন্ধু নদীর পুকুরের পাশ থেকে কথা বলছে, তারা যে অনেক দূর থেকে কথা বলছে, তা বোঝানোর জন্য আমার দূরে থেকে ছবি নিতে হবে, আর এটি হলো 'লং শট' ।

৩. দুজন বন্ধু কথা বলা শেষে বাড়ি চলে যাচ্ছে, দুজন দুদিকে চলে যাচ্ছে দেখানোর জন্য আমাদের আরেকটু দূরে থেকে দেখতে হবে, এটি হলো 'মিড শট'।

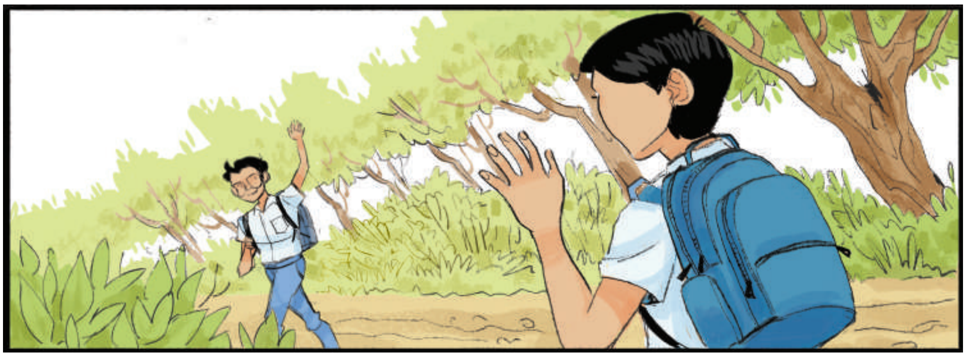

৪. দুজন বন্ধুর কথা শেষে একজন দাঁড়িয়ে আছে আরেকজন চলে যাচ্ছে। একজন যে চলে যাচ্ছে তা বোঝানোর জন্য অন্যজনের কাঁধের পেছন থেকে এমনভাবে ছবি তোলা হয় যেন একজন বন্ধুর একটি কাঁধ দেখা যায়, আর অন্য বন্ধুর চলে যাওয়া দেখা যায়, এই ধরনের শট কে বলে 'ওভার দ্য শোলডার'।

৫. বন্ধু চলে যাওয়ার পর অন্য বন্ধুটি দেখতে পেল, তার বন্ধু একটি ডায়েরি ফেলে রেখে গেছে, তখন সে দাঁড়িয়ে থেকে ঘাসে পড়ে থাকা ডায়েরিটি দেখছে, অর্থাৎ উপর থেকে নিচে একটি জিনিস দেখছে, এঁকে বলে 'বার্ডস আই ভিউ' বা 'পাখির চোখে দেখা'।

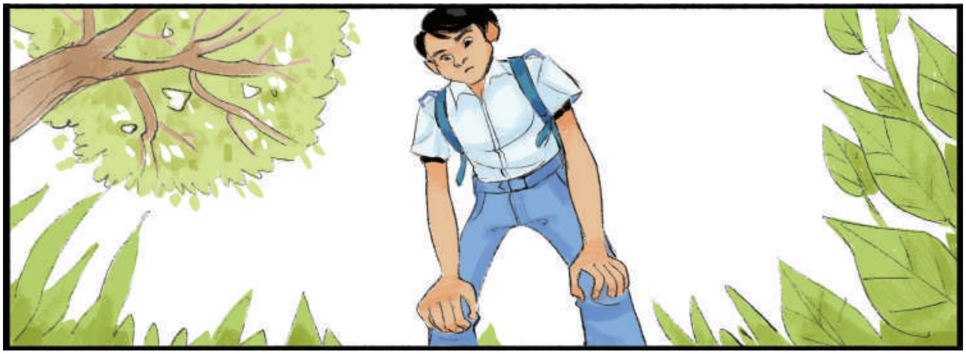

৬। ধরি, ডায়রিটির নীচে একটি পিপড়া চাপা পড়ে গেছে, সে নীচের থেকে উপরের ওই বন্ধুটির দিকে তাকিয়ে আছে, কখন সে ডায়রিটা তুলবে আর পিপড়াটি প্রাণে বাঁচবে। নিচের থেকে উপরের দিকে তাকিয়ে কিছু দেখাকে ক্যামেরা বা ছবির ভাষায় বলে 'ফ্রগ আই ভিউ' বা 'ব্যাঙের চোখে দেখা'

প্রেজেন্টেশন বা উপস্থাপন সফটওয়্যার ব্যবহার করেও আমরা খুব সহজে সমস্যাটির সমাধান সম্পর্কে সবাইকে সচেতন করতে পারি। সাম্প্রতিক সময়ের বহুল ব্যবহৃত সফটওয়্যার গুলো হলো —

১. মাক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্ট (Microsoft PowerPoint)

২. গুগল স্লাইড (Google Slide)

৩. প্রেজি (Prezi)

৪. ক্যানভা (Canva)

এই সফটওয়্যারগুলোর ফিচার কমবেশি প্রায় একই থাকে। কিছু সিম্বল বা চিহ্ন মনে রাখলেই আমরা খুব সহজেই আমরা ছবি এবং লেখা যুক্ত করে আমাদের ডিজিটাল উপস্থাপন করে ফেলতে পারব।

ইনসার্ট

ইমেজ

ভিডিও

টেক্সট

মিউজিক

দলীয় আলোচনা ও নিজেদের কনটেন্ট তৈরির পরিকল্পনা

কনটেন্ট তৈরির প্রস্তুতি:

১. আমরা আমাদের কনটেন্ট তৈরির পরিকল্পনা শিক্ষককে জানাব। যদি আমাদের কনটেন্ট তৈরিতে প্রযুক্তির কোনো সহায়তা প্রয়োজন না হয়, তবে আগামী ক্লাসের আগেই একটু একটু করে আমরা প্রতিদিন কনটেন্টটি তৈরি করে ফেলব।

২. যদি কোনো প্রযুক্তির প্রয়োজন হয় যেমন কপিউটার বা মোবাইল ফোন ইত্যাদি। তাহলে আমরা শিক্ষকের কাছ থেকে সহায়তা নিয়েই বিদ্যালয়েই আমাদের কনটেন্টটি একটু একটু করে তৈরি করে ফেলব।

৩. কনটেন্ট তৈরি করার জন্য যদি মোবাইল ফোনের প্রয়োজন হয়, আমাদের শিক্ষকের সহায়তায় আগামী ক্লাসের আগেই শিক্ষকের ফোন ব্যবহার করে নিজেদের কনটেন্ট তৈরি করে ফেলতে পারি।

৪. শিক্ষকের ছবি তোলার ফোন না থাকলে কিংবা ব্যবহার করা সম্ভব না হলে, প্রধান শিক্ষকের কাছে অভিভাবকের ফোন এক দিনের জন্য নিয়ে আসার অনুমতি চেয়ে আবেদন করব। আবেদনপত্রটি অভিভাবককে দেখিয়ে তার ফোনটি অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে এক দিনের জন্য নিয়ে আসব (দলের একজন ফোন আনলেই হবে)

৫. অভিভাবকের ফোন বিদ্যালয়ে আনা সম্ভব না হলে অভিভাবকের সহায়তায় আমরা দলের যেকোনো একজনের বাড়িতে গিয়ে তার অভিভাবকের ফোন ব্যবহার করে কাজটি সম্পন্ন করব।

৬. শিক্ষক বা অভিভাবক কারও ফোন ব্যবহার করা সম্ভব না হলে আমরা ক্যামেরার শট অনুযায়ী ছবি এঁকে গল্প বানাব। এই ক্ষেত্রে ছবি যে খুব সুন্দর হতে হবে এমন নয়, শুধু বিষয়(সাবজেক্ট) বা চরিত্র বোঝা গেলে হবে। কারও যদি স্মার্ট ফোন/ট্যাব/ কম্পিউটার ব্যবহার করে কোনো এ্যাপের মাধ্যমে ছবি আঁকা সম্ভব হয়, তাহলে আমরা সেটিও করতে পারি।

সেমিনারে কনটেন্ট উপস্থাপন   শ্রেণির বাইরের কাজ

আজকে আমাদের সেমিনার আয়োজন। আমরা প্রতিটি দল সময় ভাগ করে নিয়ে নিজেদের কাজটি সবার সামনে উপস্থাপন করব। আজ আমাদের সঙ্গে শ্রেণিকক্ষের বাইরে থেকেও অতিথি এসেছেন। আমরা তাদের সুন্দর করে অভ্যর্থনা জানাব এবং আমাদের কাজগুলো সুন্দর করে উপস্থাপন করব।

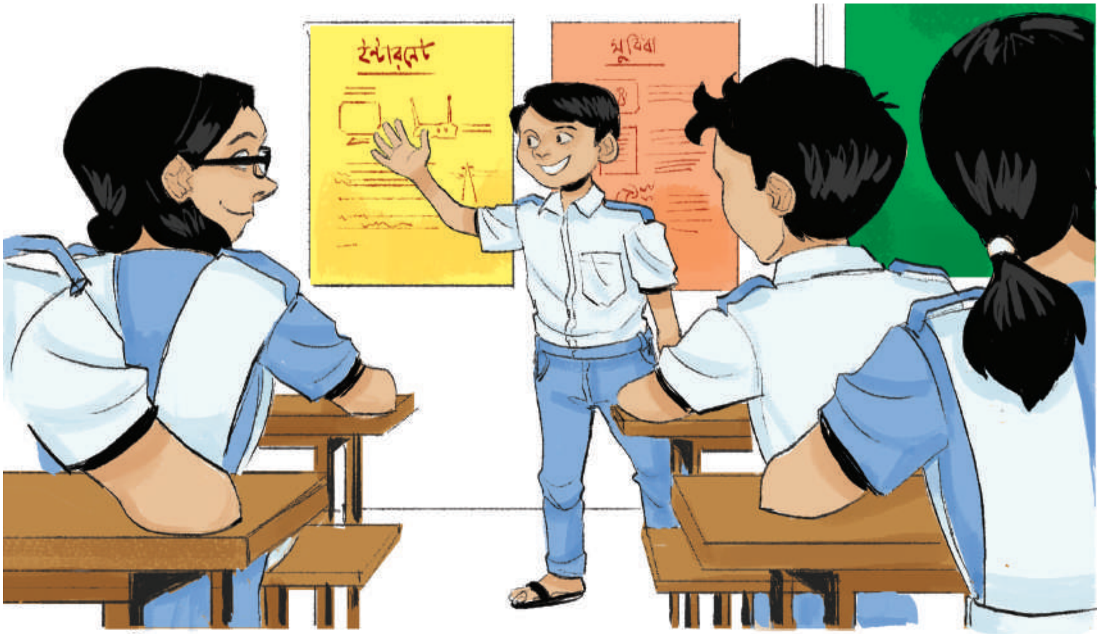

উপস্থাপন শেষে নিচের ঘরে বিস্তারিত লিখি, বছর শেষে এগুলো আমাদের ডায়েরির মতো কাজে লাগবে।

দলের নাম	
উপস্থাপনের বিষয়	
উপস্থাপনের পদ্ধতি	
কনটেন্টের টার্গেট গ্রুপ বা লক্ষ্য দল	
অতিথিদের মতামত	

সফলভাবে সেমিনার আয়োজন করার জন্য সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন !

শিখন অভিজ্ঞতা ২

বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের ব্যবহার

ষষ্ঠ শ্রেণিতে আমরা বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ ও স্বত্বাধিকারীর অধিকার সম্পর্কে জানতে পেরেছি। কিন্তু যখন ব্যক্তিগত ও বাণিজ্যিক কাজে অন্য কাউকে নিজের বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ আমরা ব্যবহার করতে দেব, আমাদের কিছু নীতিমালা তৈরি করে নেওয়া উচিত। এর ফলে কেউ আমাদের এই বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ অপব্যবহার করতে পারবে না।

তুমি কি 'মৈমনসিংহ গীতিকা'র নাম শুনেছ? এটি একটি সংকলনগ্রন্থ, যাতে ময়মনসিংহ অঞ্চলের পালাগান লিপিবদ্ধ করা আছে। এই পালাগানগুলো প্রাচীনকাল থেকে মানুষের মুখে মুখে প্রচারিত হয়ে আসছিল ময়মনসিংহ অঞ্চলে। এই বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ প্রথমে চন্দ্রকুমার সাহা সংগ্রহ করা শুরু করেন। এরপর ড. দীনেশ চন্দ্র সেন সবগুলো পালাগান একত্র করে সম্পাদনা করেন ও গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। যদি এই কাজ না করা হতো তাহলে আজ হয়তো আমরা এই অসাধারণ সংকলন পেতাম না।

কেমন হয় যদি আমরা নিজেরাই আমাদের এলাকায় কোনো বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদকে যথাযথভাবে বাণিজ্যিক ব্যবহারের উপযোগী করে তুলতে পারি? এই শিখন অভিজ্ঞতায় আমরা সেটা করার চেষ্টা করব।

সেশন ১ – ব্যক্তিগত ও বাণিজ্যিক কাজে বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ ব্যবহার

হাসির বাবা আফজাল হোসেনের একটি দই তৈরির কারখানা আছে। এই কারখানায় তৈরি দই বাজারে 'হাসি দই' নামে বিক্রি হয়। আজ হাসি এই দই কিনে হঠাৎ অবাক হয়ে আবিষ্কার করে দইয়ের স্বাদ অন্যরকম লাগছে। ভালো করে প্যাকেট লক্ষ্য করে দেখল সেখানে 'হাসি দই' এর পরিবর্তে 'হাস দই' লেখা। অথচ প্যাকেট দেখতে একই রকম, একই রং, একই সাইজ, লেখার ফন্টও একই রকম, সবকিছুই মিল আছে, শুধু 'হাসি'র জায়গায় 'হাস' লেখা।

সেটা খুব ভালো করে খেয়াল না করলে হঠাৎ বোঝার উপায় নেই এটা যে হাসি দই না! হাসি খুব চিন্তিত হয়ে বাবার কাছে গিয়ে প্যাকেট দেখিয়ে পুরো ঘটনা খুলে বলল। আফজাল হোসেন সবকিছু শুনে বললেন, তোমাকে অনেক ধন্যবাদ হাসি এই ব্যাপারটি লক্ষ্য করার জন্য।

তবে আমাদের দুশ্চিন্তার কিছু নেই। আমাদের হাসি দইয়ের স্বাদ অন্য দইয়ের তুলনায় আলাদা, তার কারণ, এই দই তৈরির ফর্মুলা আমার উদ্ভাবন করা এবং সেটি বেশ আলাদা অন্যগুলোর তুলনায়।

এ কারণে এই দই তৈরির কৌশল বা ফর্মুলা একটি বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ। যারা আমাদের কোম্পানির দই নকল করে প্রায় হুবহু একই নামে বাজারে ছেড়েছে, আমি দ্রুত আমার একজন উকিল বন্ধুর সঙ্গে পরামর্শ করে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করব।

যেহেতু আমাদের ট্রেডমার্ক করা আছে, তাই যারা আমাদের এই বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ নকল করে বাণিজ্যিকভাবে ছেড়েছে, তাদের অবশ্যই ক্ষতিপূরণ দিতে হবে ও বাণিজ্যিকভাবে এই পণ্য বাজারে বিক্রি করা বন্ধ করতে হবে। হাসি এখন একটু দুশ্চিন্তামুক্ত হলো।

উপরের গল্পে আমরা দেখতে পাচ্ছি, আফজাল হোসেন একটি বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ তৈরি করেছেন।

তিনি যেই ফর্মুলা ব্যবহার করে হাসি দই তৈরি করেছেন, সেটি অন্য দইয়ের ফর্মুলা থেকে ভিন্ন। তাই এটি একটি বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ। এরপর তিনি এটি বাজারজাত করেছেন।

বাজার থেকে যারা হাসি দই কিনছে, তারা কিন্তু শুধু পণ্য হিসেবে ব্যক্তিগত কাজে এটি কিনছে। অর্থাৎ এই দই কেনার সময় তারা দইটি শুধু খাবার অধিকার পাচ্ছেন।

এক্ষেত্রে বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার হচ্ছে।

ব্যক্তিগত কাজে বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ নির্দিষ্ট টাকা দিয়ে কেনার সময় পণ্যটি একজন মানুষ ব্যবহারের সুযোগ পেলেও সেটি বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহারের অধিকার পান না।

অন্যদিকে অন্য একটি প্রতিষ্ঠান যারা প্রায় হুবহু হাসি দইয়ের আদলে বাজারে হাস দই ছেড়েছেন তারা পণ্যটিকে বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার করছেন।

বাণিজ্যিক কাজে বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ ব্যবহার করতে গেলে অবশ্যই বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদটির যিনি স্বত্বাধিকারী তার থেকে যথাযথ আনুষ্ঠানিক অনুমতি নিয়ে, তার সঙ্গে চুক্তিপত্র করে তবেই বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার করা যাবে।

এবারে আমরা একটি কাজ করি, নিচে বেশকিছু বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। সেগুলো থেকে আমরা বের করি বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদটি ব্যক্তিগত কাজে নাকি বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং ব্যবহারটি যথাযথ হচ্ছে কি না।

ক. মিজান একটি বিখ্যাত বাংলা সিনেমা দেখার জন্য একটি ওয়েবসাইটে নিবন্ধন করল। সেখানে নির্দিষ্ট ফি পরিশোধ করে তাদের গ্রাহক হলো। কিন্তু ওই ওয়েবসাইটে সিনেমাটি দেখানোর সিনেমার প্রযোজকের কাছ থেকে অনুমতি গ্রহণ করা হয়নি। মিজান এখন খুশি মনে পছন্দের সিনেমা দেখছে।

সিদ্ধান্ত – মিজান ব্যক্তিগত কাজে বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ ব্যবহার করছে। কিন্তু ওয়েবসাইটটি সিনেমাটি প্রদর্শনের অনুমতি না নিয়েই তাদের প্ল্যাটফর্মে বাণিজ্যিক কাজে সেটি ব্যবহার করছে। কাজেই তারা নিয়ম মানছে না ও সিনেমার প্রযোজক ওয়েবসাইটের সত্ত্বাধিকারীর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন।

খ. মিতু প্রয়োজনীয় একটি সফটওয়্যার অনলাইনে খুঁজতে গিয়ে দেখল ৫০ টাকা দিয়ে সফটওয়্যারটি তৈরিকারক কোম্পানি থেকে লাইসেন্স কিনে নিতে হবে। মিতুর বন্ধু হেনা বলল, আমার কাছেই সফটওয়্যারটি আছে, কেনার কোনো প্রয়োজন নেই, তুই আমার থেকে সফটওয়্যারটি কপি করে নিস। মিতু বলল এটা একদম উচিত হবে না। সফটওয়্যারটি কেনার যথাযথ ওয়েবসাইটে গিয়ে সেটির লাইসেন্স কিনে নিয়ে মিতু এখন ব্যবহার করছে।	
সিদ্ধান্ত –	

গ. একটি বিখ্যাত কোমল পানীয় তৈরির কোম্পানি তাদের ফর্মুলা বাংলাদেশের একটি বাজারজাতকরণ কোম্পানির কাছে চুক্তিবদ্ধ হয়ে প্রদান করল। কিন্তু অন্য আরও একটি কোম্পানি সেই একই কোমল পানীয়র নামে বাজারে পণ্য বিক্রি শুরু করল। তখন যে কোম্পানি এই ফর্মুলা কিনে নিয়েছিল, তারা আদালতের দ্বারস্থ হলো।

সিদ্ধান্ত –

ঘ. রায়হান একটি ভ্রমণবিষয়ক বই লিখেছে নিজের বিভিন্ন পরিদর্শন করা স্থানের অভিজ্ঞতা নিয়ে। রায়হান একটি প্রকাশক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে মেধাস্বত্ব পাবার শর্তে বইটি প্রকাশের অনুমতি দিয়েছে। সেই প্রতিষ্ঠান এই বছর বইমেলায় বইটি প্রকাশ করেছে ও বইটি পাঠকদের মধ্যে সাড়া ফেলেছে।	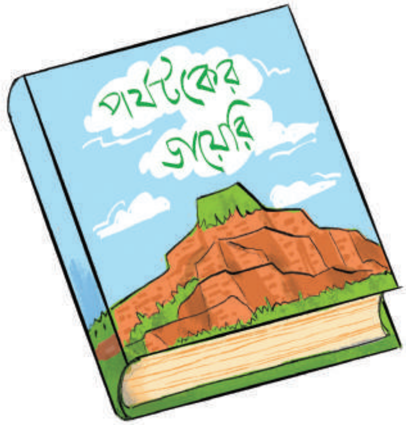

সিদ্ধান্ত –

সেশন ২ – স্বত্বাধিকারীর অধিকার সংরক্ষণ

আমরা আগের সেশনে পড়া গল্পে জেনেছিলাম বাণিজ্যিক কাজে হাসি দইয়ের অপব্যবহারের কারণে আফজাল হোসেন আদালতে মামলা করে ক্ষতিপূরণ দাবি করার কথা ভাবছেন। তবে আফজাল হোসেন ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারতেন না যদি তার ট্রেডমার্ক না করা থাকত। আমরা এর আগে ষষ্ঠ শ্রেণিতে কপিরাইট ও পেটেন্ট সম্পর্কে জেনেছিলাম। কিন্তু ট্রেডমার্ক জিনিসটা কী?

ট্রেডমার্ক হলো কোনো স্বতন্ত্র প্রতীক বা লোগো বা নাম বা স্লোগান যেটি দিয়ে একটি বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদকে একই ধরনের অন্য কোনো বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ থেকে পার্থক্য করা যায়।

একটি প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি কোনো বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদকে বাণিজ্যিকভাবে বাজারজাত করার সময় তাদের সেই সম্পদের জন্য নির্দিষ্ট ট্রেডমার্ক নিবন্ধন করেন। ফলে অন্য কেউ চাইলেই ইচ্ছেমতো তার সেই বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ নকল করে বাজারজাত করতে পারে না।

এর ফলে স্বত্বাধিকারীর অধিকার সংরক্ষিত হয় ও অন্য কেউ তার বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের অপব্যবহার করতে গেলে তিনি আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন।

বাংলাদেশ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (World Trade Organization বা WTO) -এর একটি সদস্য দেশ। তাই এই সংস্থার করে দেওয়া নিয়ম অনুসরণ করে বাংলাদেশে ট্রেডমার্ক নিবন্ধনের সুযোগ আছে।

এক্ষেত্রে একটি বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের ট্রেডমার্ক নিবন্ধনের জন্য ৫ টি ধাপ অনুসরণ করতে হয়-

ক) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্ক অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট থেকে ট্রেডমার্ক নিবন্ধনের আবেদন ফর্ম সংগ্রহ করে নির্দিষ্ট ফি জমা দিয়ে সেটি প্রথমে পূরণ করতে হয়। এই ফর্মে বিস্তারিত জানাতে হয় কেন এই বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের স্বত্বাধিকারী হিসেবে ট্রেডমার্ক নিবন্ধন করতে চাচ্ছি আমরা।

খ. অধিদপ্তরের দায়িত্বশীল কর্মকর্তা আবেদনটি যাচাই-বাছাই করবেন যে সম্পদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেটি আসলেই একটি বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ কি না, সম্পদটি ট্রেডমার্ক পাবার যোগ্য কি না, একই রকম অন্য বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের সঙ্গে এই ট্রেডমার্ক হুবহু মিলে যাচ্ছে কি না ইত্যাদি।

গ. অধিদপ্তর আবেদনটি গ্রহণযোগ্য হিসাবে পেলে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেবে ও অন্য কোনো একই ধরনের বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের ট্রেডমার্ক ধারণকারী কোনো স্বত্বাধিকারীর এই নতুন ট্রেডমার্কের ব্যাপারে আপত্তি আছে কি না, সেটি জানতে দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

ঘ. অন্য কোনো বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের স্বত্বাধিকারী নিজের ট্রেডমার্কের সঙ্গে নতুন ট্রেডমার্কের মিল খুঁজে পান, তাহলে তিনি নিজের আপত্তি জানাতে পারেন। এ জন্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট থেকে আবেদন ফর্ম পূরণ করে তাকে জমা দিতে হয়। এ সময় তিনি যুক্তি প্রদান করেন, কেন নতুন ট্রেডমার্কটি গ্রহণযোগ্য হবে না।

আবার যিনি ট্রেডমার্কের জন্য আবেদন করেছেন, তিনি নিজের ট্রেডমার্কের পক্ষে যুক্তি প্রদান করেন। এরপর অধিদপ্তর দুই পক্ষের সকল যুক্তি বিবেচনা করে এই ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেন।

ঙ. সবশেষে যদি অধিদপ্তর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয় যে আবেদনকারীকে এই ট্রেডমার্ক প্রদান করা হবে, তাহলে ট্রেডমার্কের নিবন্ধন সম্পন্ন হয়। নিবন্ধিত হবার প্রমাণপত্র হিসেবে একটি ট্রেডমার্ক সনদ ঐ স্বত্বাধিকারীর নামে প্রদান করা হয়।

আমরা এই শিখন অভিজ্ঞতার একদম শেষে একটি বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদকে যথাযথভাবে বাণিজ্যিক ব্যবহারের উপযোগী করতে যাচ্ছি তাই না? এবারে একটি কাজ করি।

সেই বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের জন্য মনের কল্পনা থেকে ট্রেডমার্ক হিসেবে কোনো লোগো বা ছবি বা ডিজাইন পরের পৃষ্ঠায় এঁকে ফেলি —

এবারে চল আরেকটি কাজ করি। আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের জন্য ট্রেডমার্কের আবেদন করার একটি নমুনা ফর্ম আমরা পূরণ করে ফেলি। এখানে যে তথ্যগুলো যেমন মোবাইল ফোন নম্বর ও ই-মেইল তোমার থাকবে না, সেগুলো চাইলে কাল্পনিক একটা তথ্য দিয়ে দিতে পারো—

আবেদনকারীর নাম:..

জাতীয়তা:..

ঠিকানা:..

মোবাইল নং.. ই-মেইল..

পণ্যের বিবরণ :..

....

....

মার্কের প্রতিরূপ (ডিজাইন)

স্বাক্ষর ও তারিখ ....

ট্রেডমার্কের মূল আবেদন পত্র দেখতে হুবহু একরকম না হলেও এখানে নমুনা ফর্মে আমরা আবেদন গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো পূরণ করেছি। আমরা যখন নিজেরা একটি বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের জন্য ট্রেডমার্কের আবেদন করব তখন আনুষ্ঠানিকভাবে (অফিসিয়াল) ফর্মটি পূরণ করতে হবে।

যদি ইন্টারনেটের সংযোগ থাকে আমরা চাইলে http://www.dpdt.gov.bd/ ওয়েবসাইটে গিয়ে ট্রেডমার্কের আবেদন ফর্ম চাইলে ডাউনলোড করে রাখতে পারি।

আগামী সেশনের প্রস্তুতি

বাংলাদেশ বা বিশ্বে ট্রেডমার্কের ব্যক্তিগত ও বাণিজ্যিক অপব্যবহারের ফলে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কোম্পানি আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। পত্রপত্রিকা বা অনলাইন সংবাদ মাধ্যম থেকে আমরা এ রকম কিছু ঘটনার তথ্য সংগ্রহ করি পরের সেশনের জন্য। পাশাপাশি এই ঘটনাগুলোর কোনটি বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহারের ক্ষেত্রে হয়েছে ও কোনটি বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহারের ক্ষেত্রে হয়েছে সেটিও ভাবি।

সেশন ৩ – ট্রেডমার্কজনিত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ নিয়ে প্রতিবেদন তৈরি

আমরা বাড়িতে বেশকিছু ঘটনা নিয়ে তথ্য অনুসন্ধান করেছি যেগুলো ট্রেডমার্ক সম্পর্কিত ছিল। এবারে আমরা এই বিষয়ে একটি প্রতিবেদন তৈরি করব।

প্রতিবেদন তৈরির জন্য এই কাজগুলো আমাদের করতে হবে—

১. সবার আগে শিক্ষক আমাদের সবাইকে কয়েকটি দলে ভাগ করে দেবেন।

২. নিজেদের দলের সকল সদস্য যে ঘটনাগুলোর তথ্য অনুসন্ধান করেছিলাম, সেগুলো নিয়ে একসঙ্গে বসে আলোচনা করব কোনো ঘটনাটি নিয়ে আমরা প্রতিবেদন তৈরি করব।

৩. আমাদের একটি নির্দিষ্ট ঘটনা নির্বাচন করে নিতে হবে। তাই ঘটনা নির্বাচনের সময় নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রকাশিত সংবাদে আছে কি না, যাচাই করব। একটি ঘটনা নিয়ে প্রকাশিত সংবাদে যদি এই বিষয়গুলো উপস্থিত থাকে, শুধু তাহলেই আমরা সেটি নিয়ে কাজ করতে পারব—

প্রাথমিক প্রশ্ন	আইনি ঘটনাটি বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ? ঘটনার সঙ্গে জড়িত দুই পক্ষের ব্যাপারে তথ্য দেওয়া আছে?
পরবর্তী প্রশ্ন	ব্যক্তিগত নাকি বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার নিয়ে সমস্যা হয়েছে? দুই পক্ষের বক্তব্যই সংবাদে আছে কি?
চূড়ান্ত প্রশ্ন	আদালতে কী রকম প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে? চূড়ান্ত রায় প্রদান হয়েছে নাকি এখনও রায় প্রদান হয়নি?

৪. এভাবে আমরা দলগতভাবে একটি ঘটনা নিয়ে কাজ করার পরিকল্পনা চূড়ান্ত করলাম। কাজের সুবিধার্থে উপরে উল্লেখিত ছয়টি প্রশ্নের প্রাপ্ত উত্তর নিচে লিখে ফেলি—

৫. এবার আমরা আমাদের নির্বাচিত ঘটনার বিভিন্ন তথ্য নিয়ে নিজেদের দলে আলোচনা করব ও পুরো ঘটনা বিশ্লেষণ করব। বিশ্লেষণ করে আমরা কী রকম সিদ্ধান্তে এলাম ও আইনি সিদ্ধান্ত নিয়ে আমরা একমত কি না, বা আমাদের এক্ষেত্রে ভাবনাগুলো কী রকম সেটি নিয়ে একটি প্রতিবেদন তৈরি করে ফেলব।

আমাদের প্রতিবেদনের মূল অংশ নিচের ছকে লিখে ফেলি—

৬। এবারে দলগতভাবে আমাদের তৈরি করা প্রতিবেদন নিয়ে শিক্ষক ও অন্য শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করি।

আমরা যখন নিজেদের তৈরি করা সাংস্কৃতিক বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদকে কাউকে বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার করতে দেব, আমাদেরও খেয়াল রাখতে হবে আমরা কোনো নীতিমালা ভঙ্গ করছি কি না বা কোনো স্বত্বাধিকারীর অধিকার ক্ষুণ্ণ করছি কি না। কারণ, এমন হলে অন্য কেউ একইভাবে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

সেশন ৪ – বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ ব্যবহারের নীতিমালা বানাই

রিতু সম্প্রতি একটি মোবাইল অ্যাপলিকেশন সফটওয়্যার তৈরি করেছে, যেটি দিয়ে নিজের বাসায় থাকা বিভিন্ন ইলেকট্রনিক ডিভাইস যেমন বাতি, পাখা ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করা যাবে।

এই সফটওয়্যারটি নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে ট্রেডমার্কও করিয়েছে যেন এটিকে বাজারজাত করতে পারে। একদিন বাবা বললেন, ‘তুমি যে সফটওয়্যার তৈরি করেছ, এটার যারা ব্যবহারকারী হবে তাদের জন্য কোনো নীতিমালা বানিয়েছ?’

এটা শুনে রিতু বেশ অবাক হয়ে বলল, ‘সফটওয়্যারটি কীভাবে চালাতে হবে সেটির নির্দেশনামালা তৈরি করেছি। কিন্তু ব্যবহারকারীর জন্য আবার কি নীতিমালা বানাব?’

তখন বাবা বললেন, ‘দেখো আমরা যখন কোনো সফটওয়্যার ইন্সটল করি, তখন প্রথমেই কিছু নীতিমালা আমাদের প্রদর্শন করে।

অর্থাৎ ঐ সফটওয়্যার ব্যবহারের ক্ষেত্রে কী কী নিয়ম মেনে চলতে হবে সেটা আমাদের জানিয়ে দেয়। সেই নিয়মগুলো মানতে আমরা সম্মতি জানালে তখনই কেবল সফটওয়্যারটি ব্যবহার করা যায়।

নইলে যে কেউ তোমার তৈরি সফটওয়্যার ইচ্ছেমতো ব্যবহার করা শুরু করবে বা সেটা পুনরায় বাজারজাত করে দিতে পারে। আর এটা শুধু সফটওয়্যার নয়, যেকোনো বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদই ব্যক্তিগত ও বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহারের নীতিমালা তৈরি করা উচিত। তাহলে সেই সম্পদ কেউ অপব্যবহার করার সুযোগ পাবে না।

সব শুনে রিতু বুঝল তাকে এখন নিজের সফটওয়্যারের জন্যই এ রকম ব্যবহারের নীতিমালা তৈরি করতে হবে।

উপরের গল্প থেকে আমরা যেটি বুঝলাম বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ যারা ব্যবহার করবে, তাদের ব্যবহারের ক্ষেত্রে কী কী বাধানিষেধ থাকবে তা স্বত্বাধিকারীকে তৈরি করে নিতে হবে।

যেমন, ধরি একটি ওয়েবসাইটে নির্দিষ্ট আইডি ও পাসওয়ার্ড দিয়ে লগইন করে বিভিন্ন সিনেমা দেখা যায়। এখন ওয়েবসাইট নির্মাতারা চান একজন তাদের ওয়েবসাইটে নিবন্ধন করলে শুধু একজনই যেন সকল কন্টেন্ট উপভোগ করেন।

অর্থাৎ একই অ্যাকাউন্ট দিয়ে যেন একাধিক মানুষ কন্টেন্ট উপভোগ না করেন। কেননা, এ রকম হলে তাদের আর্থিক ক্ষতি হবে, একই অ্যাকাউন্ট থেকে ১০০ জনও তাদের কন্টেন্ট দেখতে পারে।

এক্ষেত্রে অনলাইন প্ল্যাটফর্মকে তাদের ব্যবহারকারীদের জন্য তৈরি নীতিমালায় যুক্ত করে দিতে হবে যে একটি অ্যাকাউন্ট থেকে কোনো অবস্থাতেই একাধিক ব্যবহারকারী কন্টেন্ট দেখতে পারবেন না।

ঠিক একইভাবে যেকোনো বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের ক্ষেত্রেই ব্যবহারকারীদের জন্য এরকম নীতিমালা তৈরি করতে হয়।

আমরা এর আগের সেশনে বেশকিছু ট্রেডমার্ক-সংক্রান্ত আইনি ঘটনা সম্পর্কে দলগত উপস্থাপনা করেছিলাম।

সেখানে এ রকম বেশকিছু মামলা সম্পর্কে আমরা ধারণা পেয়েছি ও কোনো মামলায় কী কী সমস্যা ছিল সেটিও আমরা জেনেছি। এবারে আমরা নিচের কাজটি করে ফেলি—

১. বিভিন্ন মামলা সম্পর্কে যে ধারণা পেয়েছি, তার আলোকে আমরা কিছু নীতির কথা চিন্তা করি যেগুলো একটি বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ ব্যবহারের জন্য রাখা উচিত।

২. দলের সবাই মিলে আলোচনা করার পরে এবার যে নীতিগুলো আমাদের রাখা উচিত মনে হয়, সেগুলো নিচের ছকে লিখে ফেলি। লেখার সময়ে কোনো নীতিগুলো ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য আর কোনোগুলো বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য সেটিও টিক চিহ্ন দিয়ে উল্লেখ করি।

ব্যক্তিগত সম্পদ ব্যবহারের জন্য প্রস্তাবিত নীতি		
প্রস্তাবিত নীতি	ব্যক্তিগত ব্যবহার	বাণিজ্যিক ব্যবহার

ব্যক্তিগত সম্পদ ব্যবহারের জন্য প্রস্তাবিত নীতি		
প্রস্তাবিত নীতি	ব্যক্তিগত ব্যবহার	বাণিজ্যিক ব্যবহার

৩. আমরা যে নীতিগুলো ভেবেছি, তার মধ্যে কিছু নিয়ম ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য প্রয়োজন হবে। আবার একইভাবে কিছু নিয়ম বাণিজ্যিক ব্যবহারের সময়ে প্রয়োজন হবে। সেভাবেই আমরা চিহ্নিত করেছি। এবারে সবগুলো নিয়মগুলো সমন্বয় করে আমরা সামনে যে বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ নিয়ে কাজ করতে যাচ্ছি, সেটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমরা নিজেরা কোনো নীতিমালা অনুসরণ করব, সেটি উল্লেখ করে একটি আর্টিকেল তৈরি করি। আর্টিকেলের প্রধান অংশ নিচে উল্লেখ করি—

সেশন ৫ চল বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদকে যথাযথ বাণিজ্যিক ব্যবহারের উপযোগী বানাই

অনুসন্ধানমূলক কাজ

আমরা তো বিভিন্ন রকম বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ সম্পর্কে আগেও জেনেছি। যদি নিজেদের এলাকা বা জেলার কথা ভাবি। এখানে কী কী বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ থাকতে পারে? একটি এলাকার নির্দিষ্ট কোনো খাবার, কোনো ঐতিহ্যবাহী বাড়ি বা স্থান, গান, শ্লোক, নাচ, শব্দ বা ভাষা কিংবা সেই এলাকার কোনো বাদ্যযন্ত্র, স্থাপনা ইত্যাদি হতে পারে সেই এলাকার বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ। আমরা কি নিজেদের এলাকার এমন কোনো বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের কথা জানি যেটা হয়তো এখন আর বাকিদের কাছে সেভাবে পরিচিত নয় অথবা সেটির কোনো ট্রেডমার্ক করা নেই? আমরা নিজেরা এবার একইভাবে আমাদের নিজেদের এলাকার একটি বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ নিয়ে কাজ করতে যাচ্ছি —

১. প্রথমে আমরা আগের মতো প্রতিটি দল নিজেদের এলাকায় বা জেলায় এমন বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ খুঁজব।

২. শিক্ষকের অনুমতিক্রমে এই অনুসন্ধানের জন্য অনেক লম্বা সময় নেওয়া যেতে পারে।

৩. এক্ষেত্রে এলাকার বিভিন্ন মানুষের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। কারণ, তাদের কাছে এমন উপাদানের ব্যাপারে তথ্য থাকতে পারে।

৪. এরপর আমাদের নির্বাচিত বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ সংগ্রহ করার পর বিস্তারিত কন্টেন্ট আমরা সংগ্রহ করব। কন্টেন্ট হিসেবে এখানে লেখা, কোনো ছবি, ভিডিও ইত্যাদি কিছু হতে পারে।

৫. এবারে সেই কন্টেন্ট আমরা বাণিজ্যিক ব্যবহারের উপযোগী করে তুলব। বাণিজ্যিক ব্যবহারের উপযোগী করার জন্য সম্পদটিকে ট্রেডমার্ক নিবন্ধন করতে হবে। আমরা তো এর আগে জেনেছি কীভাবে বাণিজ্যিক ব্যবহারের উপযোগী বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের জন্য ট্রেডমার্ক নিবন্ধন করতে হয়। নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটে গিয়ে সেই পদ্ধতি অনুসরণ করে আমরা ঐ বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের ট্রেডমার্ক নেবন্ধনের জন্য আবেদন করব।

৬. এক্ষেত্রে অবশ্যই বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের মূল স্বত্বাধিকারীকে প্রথমে বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ কী ও সেটির ট্রেডমার্ক করার গুরুত্ব বুঝিয়ে বলতে হবে। কাজেই তোমাদের দলকে মূল স্বত্বাধিকারীকে এ সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা দিতে হবে। যেন তিনি সম্মত হন তার বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদকে ট্রেডমার্ক নিবন্ধন করার জন্য।

৭. এরপর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ট্রেডমার্কের নিবন্ধনের আবেদন করে বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের স্বত্বাধিকারীকে তার পরবর্তী দায়িত্ব বুঝিয়ে দিতে হবে।

৮. এরপর ঐ বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ বাণিজ্যিক ব্যবহারের একটি নীতিমালা তৈরি করতে হবে। এই নীতিমালা তৈরিতেও মূল স্বত্বাধিকারীকে তোমরা সাহায্য করবে বইয়ে দেখানো নিয়ম অনুসরণ করে।

৯. তাহলে তার বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদটিকে যথাযথ বাণিজ্যিক ব্যবহারের উপযোগী করতে তোমরা সহায়তা করতে পারবে।

নিশ্চয়ই পুরো কাজটি শেষ করার পর তোমার এলাকার সেই স্বত্বাধিকারী অনেক উপকৃত হবেন। পাশাপাশি তুমি নিজেও যখন একটি বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের স্বত্বাধিকারী হবে, তোমারও এই পূর্বের অভিজ্ঞতা কাজে লাগবে। দারুণ না? একজনের উপকার করতে গিয়ে তোমাদের দলের সবাই নিজেরাও চমৎকার একটি অভিজ্ঞতা অর্জন করলে।

আমাদের পুরো কাজ করার সময়ে নিচের ছক অনুযায়ী আমরা বিভিন্ন সপ্তাহে বিভিন্ন কাজ করব –

সপ্তাহ	কাজ
১ম ও ২য় সপ্তাহ	বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের অনুসন্ধান কেন্দ্র হবে।
৩য় সপ্তাহ	দলের সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নেওয়া কোনো বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ নিয়ে কাজ করা হবে।
৪র্থ সপ্তাহ	বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদকে কন্টেন্ট আকারে সংগ্রহ করা।
৫ম সপ্তাহ	বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের মূল স্বত্বাধিকারীকে তার সম্পদের বাণিজ্যিক যথাযথ ব্যবহার সম্পর্কে ধারণা প্রদান।
৬ষ্ঠ সপ্তাহ	ট্রেডমার্ক নিবন্ধনের জন্য আবেদন।
৭ম সপ্তাহ	বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদটির বাণিজ্যিক ব্যবহারের নীতিমালা তৈরি।
৭ম সপ্তাহ	শ্রেণিকক্ষে নিজেদের পুরো কাজের অভিজ্ঞতা বিনিময়।

দেখেছ কী সুন্দর একটি বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ নিয়ে এই শিখন অভিজ্ঞতায় আমরা কাজ করেছি? তোমাকে ও তোমার দলকে অভিনন্দন! একইভাবে তুমি নিজে যখন কোনো বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ তৈরি করবে সেটির ব্যক্তিগত ও বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় ধাপগুলো অনুসরণ করবে। তাহলে তোমার বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের কেউ অপব্যবহার করতে পারবে না।

শিখন অভিজ্ঞতা ৩ তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে ভার্চুয়াল পরিচিতি তৈরী

বাস্তব জীবনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমাদের পরিচিতি থাকে। বিদ্যালয়ে বা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে এক ধরনের পরিচিতি, আবার ব্যক্তিগত বা বন্ধুবান্ধবের কাছে আরেক ধরনের পরিচিতি থাকে। আরেকটা জগতেও এখন আমাদের পরিচিতি থাকে, সেটি হলো ভার্চুয়াল জগৎ। ভার্চুয়াল জগৎ হলো যেখানে সরাসরি আমাকে কেউ দেখে না, কিন্তু আমার ডিজিটাল উপস্থিতি দেখে। এখানে আমাদের নিজেদের পরিচিতি না দিয়ে কোনো কাজ করা যায় না। যেকোনো ওয়েবসাইটে আমাদের আগে নিজের পরিচিতি দিয়ে বা তৈরি করে পরবর্তী ধাপে যেতে হয়। এ জন্য আমাদের জেনে নেওয়া উচিত যে কী করে নিজের ভার্চুয়াল পরিচিতি তৈরি করতে হয়, ভার্চুয়াল পরিচিতির জন্য কী কী তথ্য দেওয়া উচিত বা ভার্চুয়াল পরিচিতির নৈতিক দিকগুলোই বা কী। আমরা আগামী কয়েকটি সেশনে কিছু কাজের মাধ্যমে এই অভিজ্ঞতাই অর্জন করব।

সেশন ১ ভার্চুয়াল পরিচিতির ধারণা

সুপ্রিয় শিক্ষার্থী, শুভেচ্ছা! আমাদের ভার্চুয়াল পরিচিতি বিষয়ে সবারই মোটামুটি আগের কিছু অভিজ্ঞতা রয়েছে, ঠিক জানতাম না যে এটিই ভার্চুয়াল পরিচিতি। আমরা কত জায়গায় কত তথ্য দিয়ে দিই যা পরে আমরা বিভিন্ন ওয়েবসাইটে দেখতে পাই। প্রয়োজনীয় কোনো সেবা গ্রহণ করতে আমাদের প্রথমেই আমাদের একটি অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে হয়। সে জন্য সেই সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে গিয়ে আমাদের নিবন্ধন করতে হয়। পরের পৃষ্ঠায় দেয়া ছবিতে একজনের প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে একটি ভার্চুয়াল পরিচিতি দেখতে পাচ্ছি। এবার আমরা বের করি এই ভার্চুয়াল পরিচিতিতে কী কী তথ্য দেওয়া হয়েছে...

অলিনা

ব্যক্তিগত তথ্য

আইডি/রোল নং:	০০২২৬৬৫০
মাতার নাম:	ফেরদৌস আরা ইমা
পিতার নাম:	হুমায়ুন কবীর
জন্ম তারিখ:	০১/০১/২০১০
ঠিকানা:	কাপাশিয়া, গাজীপুর
স্কুলের নাম:	চিনাডুলি হাই স্কুল
শ্রেণি:	৭ম
শখ:	ছবি আঁকা
যোগাযোগ:	kabir@email.com

উপরের ছবিতে অলিনা কী কী তথ্য প্রকাশ করেছে সেগুলো নিচের ঘরে লিখি...

পিতার নাম

জন্ম তারিখ

ভার্চুয়াল পরিচিতি

ভার্চুয়াল পরিচিতি হলো আমাদের সম্পর্কে দেওয়া কিছু তথ্য যা ডিজিটাল যোগাযোগমাধ্যম বা ডিজিটাল সামাজিকমাধ্যমে ব্যবহার করার জন্য একটি পরিচিতি। যেমন আমাদের রোল নম্বর। এটি কিন্তু আমার নাম বা ছবি নয়। কিন্তু একটি নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটে ব্যবহার করলে এটি দিয়ে আমাকে চিনে ফেলা যেতে পারে। অনেক সময় আমরা ছদ্মনামেও আমাদের পরিচিতি তুলে ধরি, তখন সরাসরি আমাদের নিজের পরিচয় প্রকাশ করি না। এখন মনে করি, আমার প্রিয় প্রাণী সিংহ। আমি স্কুলের দেয়ালিকায় নিজের পরিচিতিতে সবসময় একটি সিংহের ছবি দিচ্ছি। আস্তে আস্তে সবাই আমাকে এই ছবি দিয়ে চেনা শুরু করবে। এটি হলো এক ধরনের ভার্চুয়াল পরিচিতি। যেহেতু ডিজিটাল মাধ্যমে সব কিছু খুব দ্রুত আর বড় পরিসরে হয়, তাই সেখানে এই চেনার কাজটি আস্তে হবে না; বরং খুব দ্রুত অনেক বেশি মানুষের মধ্যে এটি ছড়িয়ে যাবে। কাজেই সেখানে সব কিছু একটু ভেবেচিন্তে করা ভালো। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভুল বা ছদ্ম পরিচয় দিলে চলবে না, এতে আমাদের সমস্যা হতে পারে। যেমন আমি সরকারি কোনো একটি সেবা প্রতিষ্ঠানের গ্রাহক হিসেবে নিবন্ধন করলাম। সেখানে আমি ছদ্মনাম ও ছদ্ম ছবি ব্যবহার করলে তথ্য যাচাইয়ে আমাকে হয়তো তারা সেবাটা দেবে না। তাই অবস্থা প্রেক্ষিতে আমাদের পরিচিতি তুলে ধরতে হবে। আবার বিশ্বস্ত কোনো ওয়েবসাইট ছাড়া ব্যক্তিগত তথ্য দেওয়া যাবে না।

[জানা-অজানা]

আমরা এখন একটি কাজ করব। নিচে দুইজন পেশাজীবি ব্যক্তির ছবি দেওয়া আছে।

ডাক্তার

শিক্ষক

আমরা ৬ টি দলে ভাগ হয়ে যাব এবং প্রতিটি দল উপরের যেকোনো একজন পেশাজীবির সম্পর্কে লিখব যে তাঁদের কী কী আমাদের জানা থাকে আর কী কী জানা থাকে না। সেই পয়েন্টগুলো নিচের ছকে লিখব।

জানা	অজানা
১। নাম	১। পাসপোর্ট নম্বর
২।	২।
৩।	৩।
৪।	৪।
৫।	৫।

উপরের কাজটি করে আমরা জানলাম যে বিখ্যাত ব্যক্তিদের প্রোফাইলের তথ্য ভার্চুয়াল জগতে পাওয়া গেলেও কিছু ব্যক্তিগত তথ্য রয়েছে যা আমরা জানতে পারি না। আমাদেরকেও এমন অনেক তথ্য ভার্চুয়াল পরিচিতির মধ্যে দেওয়া উচিত নয়।

সেশন ২ নিজের ভার্চুয়াল পরিচিতি তৈরি

এখনকার সময়ে নিজের একটা ভার্চুয়াল পরিচিতি সবারই থাকে। সামাজিক, পারিবারিক বা শিক্ষাকেন্দ্রিক সবারই একটা পরিচিতি বা প্রোফাইল থাকে। কারও দুটি আবার কারও তিনটি প্রোফাইল বা পরিচিতি থাকে। কখনও কখনও কোনো সেবা পাবার পূর্ব শর্তই হলো একটি প্রোফাইল তৈরি করা। তাই এই সেশনে আমরা অভিজ্ঞতা নেব কী করে— নৈতিক দিক বিবেচনা করে একটি প্রোফাইল তৈরি করা যায়।

একটি ব্যাংকের অনলাইন অ্যাপ এর মাধ্যমে আরাফের বিদ্যালয়ের প্রতি মাসের বেতন পরিশোধের সিদ্ধান্ত নিলেন। সেজন্য তার বাবাকে বিভিন্ন তথ্য দিয়ে একটি এ্যাকাউন্ট খুলতে হল। এখন সেই অ্যাপ এ প্রবেশ করলে তার বাবার কিছু তথ্য প্রোফাইলে দেখা যায়। কোন সরকারি ই-সেবা বা বেসরকারি ই-কমার্স সেবা নেবার সময় প্রতিষ্ঠানগুলোর জানা দরকার কে এই সেবাটি চাইছে। তখন সেইসব প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে ভার্চুয়াল পরিচিতি তৈরি করতে হয়। অনেক জায়গায় এটিকে অ্যাকাউন্ট বলে। অনেকটা ব্যাংকের অ্যাকাউন্টের মত। ঠিক যতটুকু তথ্য না হলে চলবে না ততটুকু তথ্যই দেয়ার নিয়ম। অতিরিক্ত তথ্য কখনই দেয়া উচিৎ নয়। ভার্চুয়াল জগতের সবচেয়ে বড় সম্পদ হলো নিজের ব্যক্তিগত তথ্য। আমি যেমন আমার বাসায় মিনিটে মিনিটে কী ঘটছে সেটি মাইক দিয়ে বাইরের দরজায় দাঁড়িয়ে ঘোষণা করি না, তেমনি আমার ব্যক্তিগত জীবনে কখন কি ঘটছে সেগুলো আগ বাড়িয়ে ভার্চুয়াল জগতে জানানো উচিত নয়। মনে রাখতে হবে, যে তথ্য একবার আমি ডিজিটাল মাধ্যমে রাখব সেটি চিরকালের জন্য প্রকাশ্য থেকে যাবে।

প্রোফাইল আমরা দুই ভাবে তৈরি করতে পারি। কোনো সেবা নেওয়ার জন্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক চাওয়া তথ্য দিয়ে ঐ প্রতিষ্ঠানের জন্য আমাদের পরিচিতি তৈরি করা। আবার নিজেই নিজেকে ভার্চুয়াল জগতে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য প্রোফাইল তৈরি করা। এ জন্য আমার কী কী তথ্য আমি ভার্চুয়াল জগতে রাখতে পারি, সে ব্যাপারে আমাকে খেয়াল রাখতে হবে। আগের সেশনে আমরা দেখেছি কোনো কোনো তথ্য অন্যকে জানানো যায় আর কোনো কোনো তথ্য আমরা জানাব না। আমরা আরেকটু বড় হলে সামাজিক যোগাযোগ বা পেশাগত মাধ্যমে নিজেদের প্রোফাইল তৈরি করে সেটা সবার কাছে শেয়ার করতে পারি। সবার জন্য প্রকাশ করাকে বলা হয় **পাবলিক শেয়ারিং**। আর যদি একদম ব্যক্তিগত তথ্য নির্দিষ্ট কারও সঙ্গে বিনিময় করি, সেটাকে বলা হয় **প্রাইভেট শেয়ারিং**। এই অপশনগুলো চালু বা বন্ধ রাখতে পারি। তাই প্রয়োজন অনুসারে আমরা এই ব্যবস্থা নেব। অনেক সময় যদি তেমন কোনো নিয়ম না থাকে আমরা নিজেদের ছবি ভার্চুয়াল জগতে প্রকাশ না করে অ্যাভাটার ব্যবহার করতে পারি।

অ্যাভাটার হলো ভার্চুয়াল পরিচিতির জন্য নিজের ছবি ব্যবহার না করে প্রতীকী ছবি ব্যবহার করা। বাংলা শব্দ অবতার থেকে এই শব্দটি এসেছে। কোনো কোনো সামাজিকমাধ্যমে অনেক অ্যাভাটার দেওয়া থাকে, আমরা পছন্দমতো যেকোনো একটি নিজের পরিচিতির জন্য ব্যবহার করতে পারি। আবার নিজের অ্যাভাটার নিজেও তৈরি করে নিতে পারি।

নিচের ছবিটি দেখি। এই ওয়েবসাইটে গিয়ে আমরা অনেক ধরনের সরকারি সেবা নিতে পারি।

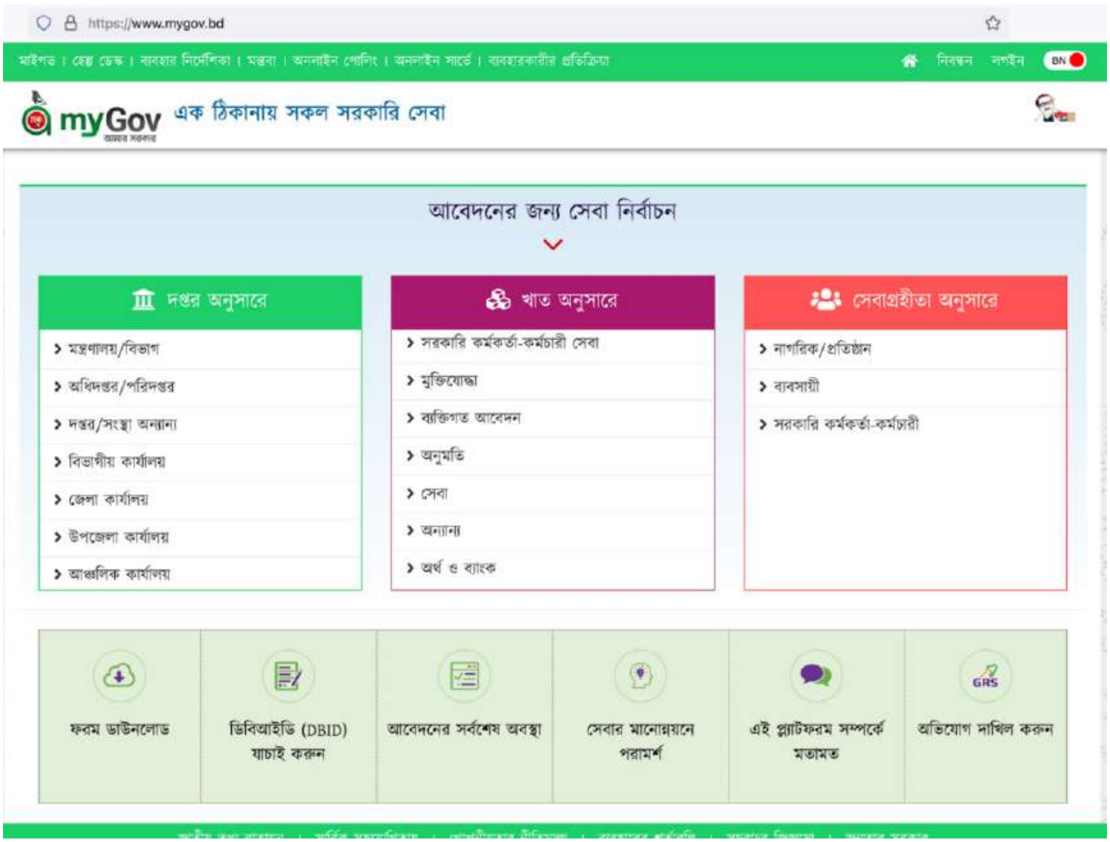

এখন আমরা উপরের ছবিতে কোথায় নিবন্ধন কথাটি আছে তা খুঁজে বের করি এবং সেটিতে গোল চিহ্ন দিই। এই নিবন্ধন কথাটির উপর চাপ দিলে নিচের ছবিটি আসবে।

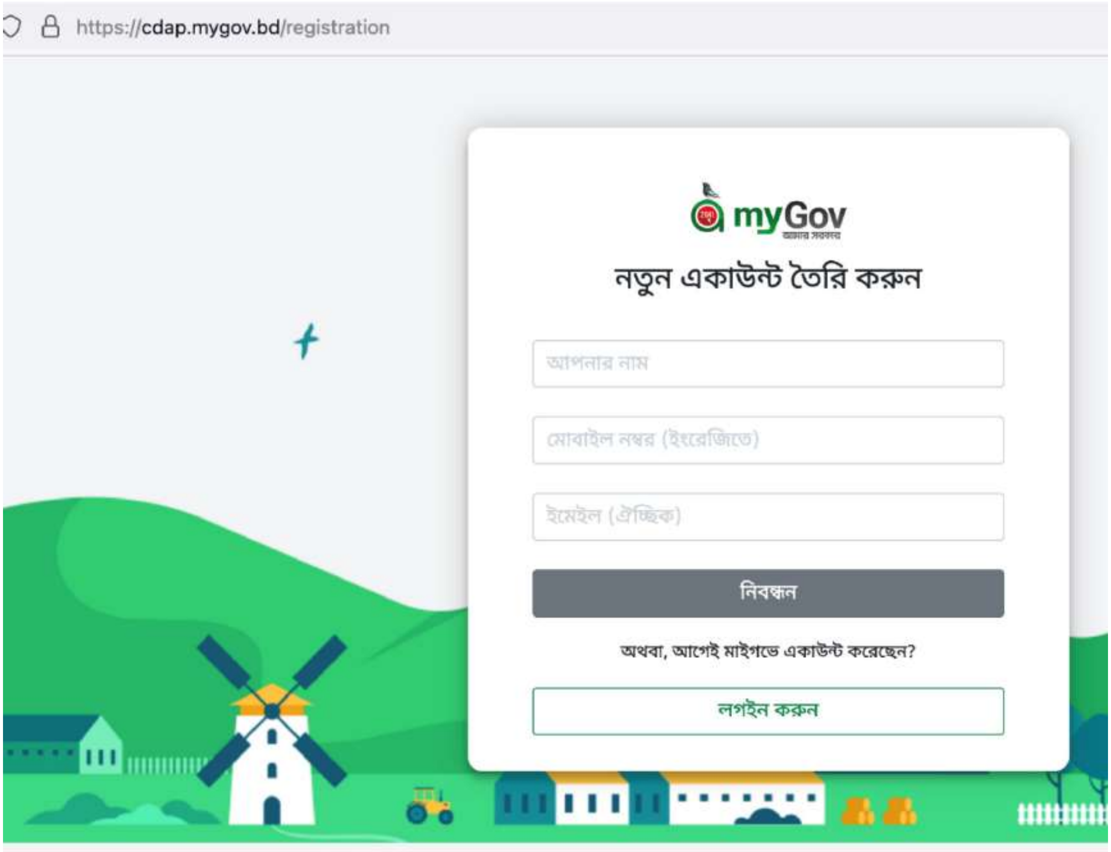

এখানে নতুন অ্যাকাউন্ট বলতে নতুন ভার্চুয়াল পরিচিতি তৈরি করা বুঝাচ্ছে। মনে রাখবে সরকারকে ভুল তথ্য দেওয়া আইনত দণ্ডনীয়। অর্থাৎ এ ধরনের ওয়েবসাইটে নিজেদের সঠিক তথ্যই দিতে হয়।

এ রকম অনেক ওয়েবসাইট রয়েছে যেখান থেকে সেবা নেওয়ার আগেই আমাদের একটি অ্যাকাউন্ট বা ভার্চুয়াল পরিচিতি তৈরি করে নিতে হয়। এটি হলো সেবা গ্রহণের জন্য ভার্চুয়াল পরিচিত।

আগামী সেশনের প্রস্তুতি

আমরা যদি নিজেরাই কোনো ওয়েবসাইটে নিজেদের পছন্দমতো পরিচিতি দিতে চাই তাহলে আমাদের পরিচিতি পেজটি কেমন হবে তার একটি ডিজাইন আগাম তৈরি করে রাখি। পরের পাতায় খালি ঘরে আমাদের তথ্য দিয়ে একটি ভার্চুয়াল পরিচিতির পেজ তৈরি করি। ছবির বদলে নিজেদের আঁকা এ্যাভাটার দিব।

আমার প্রোফাইল

আমার নাম

আমার বিদ্যালয়ের নাম

আমি কী কী করতে পছন্দ করি

আমি যে ভালো কাজগুলো করেছি

সেশন ৩ ভার্চুয়াল পরিচিতি পর্যালোচনা

আগের ক্লাসে আমরা জেনেছি কি করে ভার্চুয়াল পরিচিতি তৈরি করতে হয়। আমরা হাতে লিখেও একটা প্রোফাইল তৈরি করেছিলাম। হাতে লিখে তৈরি করা প্রোফাইল বা ভার্চুয়াল প্রোফাইলের মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য না থাকলেও ভার্চুয়াল প্রোফাইল সবার কাছে উন্মুক্ত হয়ে যায়। তাই আমাদের প্রতিটি বিষয় বিবেচনা করে আমাদের ভার্চুয়াল পরিচিতি সকলের নিকট উপস্থাপন করা উচিত। নিচে মাইক্রোসফট এর প্রতিষ্ঠাতা বিল গেটস এর ভার্চুয়াল পরিচিতির তিনটি চিত্র দেওয়া হলো। একটি টুইটার, একটি লিংকডিন আরেকটি ফেইসবুক থেকে নেওয়া হয়েছে। টুইটার, লিংকডিন এবং ফেইসবুক এই সবগুলোই হচ্ছে বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম। এর যে কোন একটি দেখে আমরা তুলনা করে নেব আমাদের হাতে লেখা পরিচিতির সঙ্গে এর মিল ও অমিল কী কী রয়েছে।

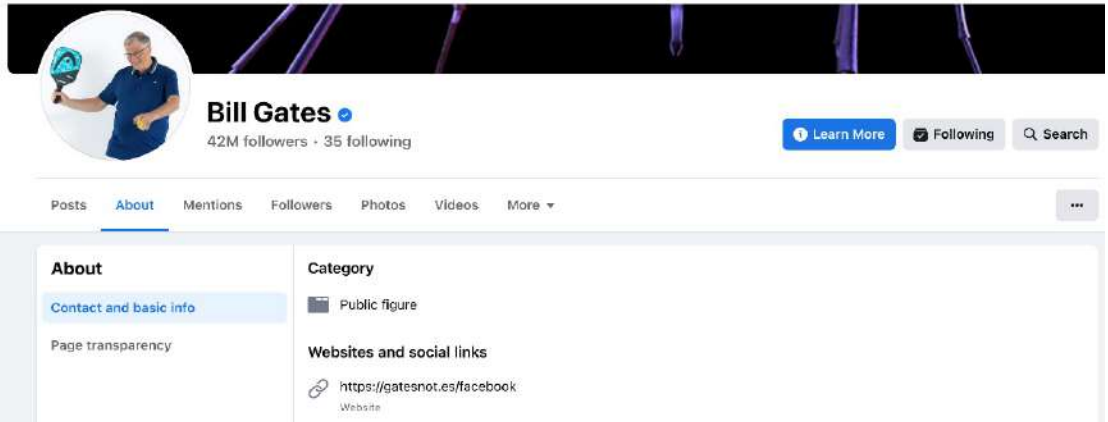

উপরের তথ্যগুলো বিবেচনা করে আমরাও তাহলে একটি প্রোফাইল বা ভার্চুয়াল পরিচিতি তৈরি করে নিই। আমাদের বয়সী শিক্ষার্থীদের জন্য তৈরি করা ‘কিশোর বাতায়ন’-এর স্ক্রিনশট ফর্মটিতে নিজেদের প্রোফাইল তৈরি করার কাজটি অনুশীলন করে নিই।

এবার আমরা নিচের প্রশ্নের উত্তরগুলো দলে আলোচনা করে খোঁজার চেষ্টা করি

১. বিল গেটসের প্রোফাইলটি কবে খোলা হয়েছে?

উত্তর:

২. বিল গেটসের প্রোফাইলটি কতজন অনুসরণ করছে?

উত্তর:

৩. কি করে বুঝবো যে এটি তাঁর প্রকৃত প্রোফাইল বা পরিচিতি?

উত্তর:

৪. এটি ছাড়াও আর কোন কোন মাধ্যমে তার প্রোফাইল রয়েছে?

উত্তর:

৫. মাইক্রোসফট ছাড়াও কোন কোন বিল গেটসের আর কী কী প্রতিষ্ঠান রয়েছে?

উত্তর:

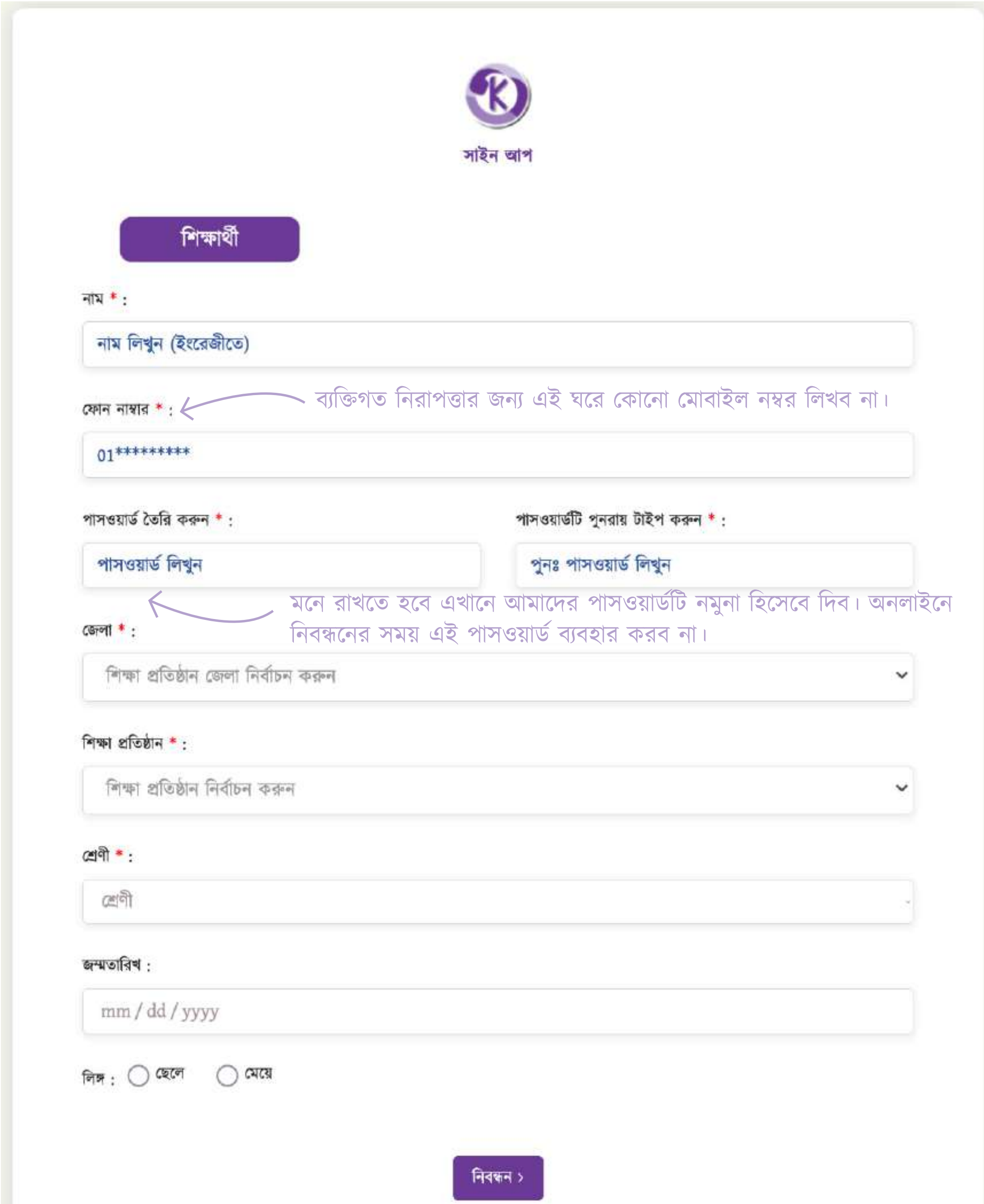

সাইন আপ

শিক্ষার্থী

নাম * :

নাম লিখুন (ইংরেজীতে)

ফোন নাম্বার * :

01*********

পাসওয়ার্ড তৈরি করুন * :

পাসওয়ার্ড লিখুন

পাসওয়ার্ডটি পুনরায় টাইপ করুন * :

পুনঃ পাসওয়ার্ড লিখুন

জেলা * :

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জেলা নির্বাচন করুন

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান * :

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করুন

শ্রেণী * :

শ্রেণী

জন্মতারিখ :

mm / dd / yyyy

লিঙ্গ : ছেলে মেয়ে

নিবন্ধন ›

ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য এই ঘরে কোনো মোবাইল নম্বর লিখব না।

মনে রাখতে হবে এখানে আমাদের পাসওয়ার্ডটি নমুনা হিসেবে দিব। অনলাইনে নিবন্ধনের সময় এই পাসওয়ার্ড ব্যবহার করব না।

সেশন ৪ নিজের একটি ভার্চুয়াল পরিচিতি তৈরি করি

আজকে আমরা কিশোর বাতায়নে নিবন্ধন করব। আমাদের বইয়ে গতকাল যে তথ্যগুলো লিখেছিলাম সেগুলো ব্যবহার করে কিশোর বাতায়নের রেজিস্ট্রেশন বা নিবন্ধন সম্পন্ন করব।

ভার্চুয়াল পরিচিতি ব্যবহারের নৈতিক দিক

অনেক সময় আমরা দেখতে পাই যে আমাদের কোনো পরিচিত মানুষ ভুল করে অতিরিক্ত ব্যক্তিগত তথ্য তার ভার্চুয়াল পরিচিতিতে দিয়ে দিয়েছে। এর অর্থ হলো আমরা ডিজিটাল মাধ্যমে হঠাৎ করে তার ব্যাপারে এমন কিছু জেনে ফেলেছি যেটি আমাদের জানার কথা নয়। তাহলে কি আমরা সেই তথ্যের অপব্যবহার করব? কখনোই না। আমরা তাকে নিরাপদভাবে জানিয়ে দিব যেন সে তথ্যটি মুছে ফেলে। আমরা কি কখনও আমার ভার্চুয়াল পরিচিতিতে নিজে যা নই সেটি দাবি করব? প্রথমতো, কখনও নিজের ব্যাপারে ভুল বা অতিরঞ্জিত তথ্য একবার ডিজিটাল মাধ্যমে চলে গেলে সেটি মুছে ফেলা প্রায় অসম্ভব। কাজেই আমরা এমন কোনো কাজ করব না যেটি ত্রিশ-চল্লিশ বছর পরও আতঙ্ক হয়ে আমাদের তাড়া করে বেড়াবে।

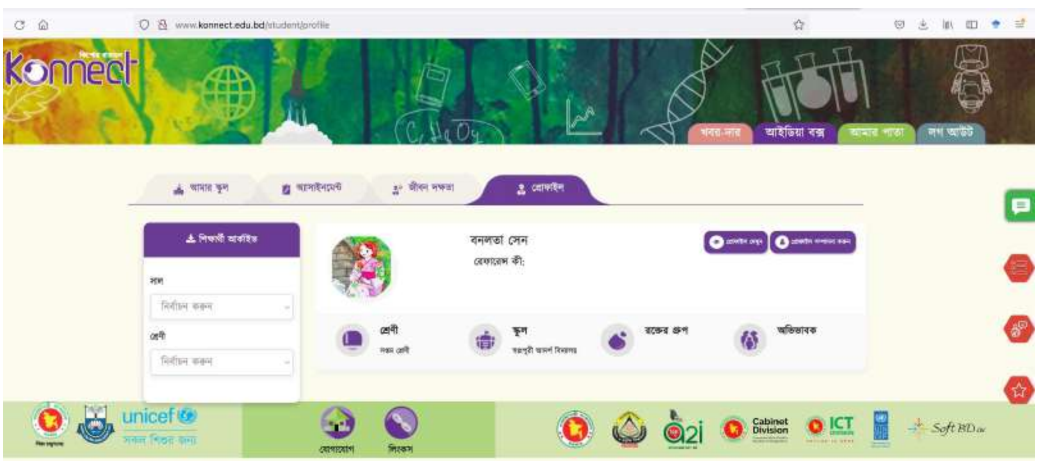

কিশোর বাতায়ন বা কানেক্টে রেজিস্ট্রেশন বা সাইন আপ করার পর আমার ভার্চুয়াল পরিচিতির বিস্তারিত তথ্য দেওয়ার জন্য আমাকে তথ্য সম্পাদনা করতে হবে। কী কী তথ্য দিতে হয় তা পরের ছবিতে দেখা যাচ্ছে। সে অনুযায়ী আমরা তথ্য প্রদান করব।

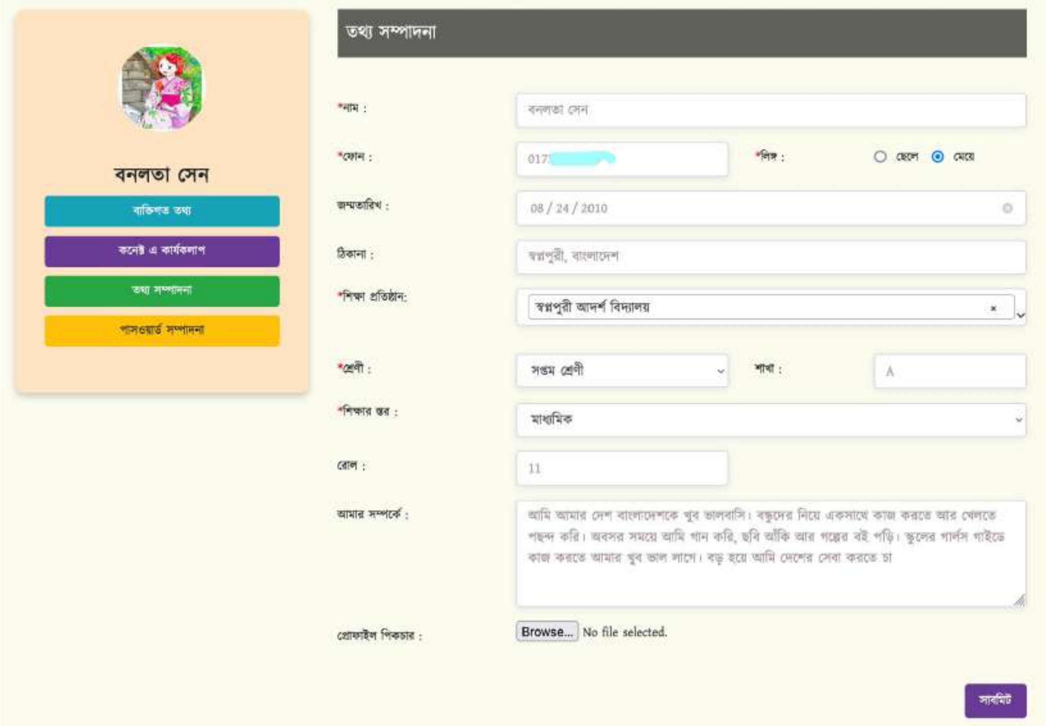

কিশোর বাতায়নের মতো করেই আরও অনেক সেবা নেওয়ার জন্য পরবর্তীতে আমাদের ভার্চুয়াল পরিচিতি তৈরি করতে হবে। ই-কমার্স বা নাগরিক সেবা নিতে বিভিন্ন ওয়েবসাইটে আমাদের নিজস্ব তথ্য দিয়ে ভার্চুয়াল পরিচিতি তৈরি করতে হয়। নিরাপদ ওয়েবসাইটে আমাদের সঠিক তথ্য ও ছবি দিতে হয়, আবার যেক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, সেখানে নিজের সব পরিচয় প্রকাশ করাও ঠিক নয়। এমন অনেক মাধ্যম রয়েছে, যেখানে সকল তথ্য দেওয়া ঝুঁকিপূর্ণ, এ জন্য আমাদের নিরাপদ ভার্চুয়াল পরিচিতি তৈরি করা জরুরি।

শিখন অভিজ্ঞতা ৪ সাইবার গোয়েন্দাগিরি

বন্ধুরা এবার আমরা সাইবার অপরাধ সম্পর্কে জানব। সাইবার হচ্ছে আলাদা একটা জগৎ, যেখানে আমাদের ভার্চুয়াল পরিচয় থাকে আমাদের আরেকটি ভার্চুয়াল জগৎ তৈরি হয়। আমাদের সেই জগতের নিরাপত্তা জানতে হবে সেই জগতে কীভাবে আমরা নিজেদের নিরাপদ রাখব এবং পরিবার ও সমাজকেও নিরাপদে রাখব সেই বিষয় শিখব আমরা সাইবারে গোয়েন্দাগিরিতে। সব সময় মনে রাখবে যে সাইবার জগৎ এবং বাস্তব জগৎ একে অন্যের সঙ্গে জড়িত। যেকোনো একটিতে সমস্যা হলে অন্যটিও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। আমাদের এই ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্ক থাকতে হবে। আমরা নিজেরা সচেতন হব এবং কীভাবে সবাইকে সচেতন করা যায় সেটি নিয়ে কাজ করব।

পিনাকে তো তোমরা সবাই চেনো, ক্লাস সিক্স ইমেইল পাঠানোর সময় তোমাদের ন্যানো -এর সঙ্গেও পরিচয় হয়েছে। ছোট্ট রোবট ন্যানো পিনাকে অনেক সাহায্য করেছিল। পিনা ক্লাস সেভেনে উঠেছে। গতকাল তার অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী মামার সঙ্গে কথা হয়। মামা পিনাকে বলেন— 'পিনা তুই এখন বড় হচ্ছিস তোকে এখন সাইবার নিরাপত্তা সম্পর্কে জানতে হবে। এই সাইবার জগৎ আমাদের অনেকভাবে উপকার করলেও এখানেও অনেক খারাপ মানুষ রয়েছে। যারা প্রযুক্তি ব্যবহার করে নানা ধরনের অপরাধ সংঘটিত করে। এর মধ্যে রয়েছে নানা ধরনের হ্যাকিং, হুমকি দেওয়া, কারও মনে কষ্ট দেওয়া , ভুল তথ্য বা গুজব ছড়িয়ে দেশ ও রাষ্ট্রের ক্ষতি করা, অন্যের নাম ব্যবহার করে অন্যায় করে এরকম অনেক কিছু'। পিনা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে 'এই ছোট্ট কম্পিউটারের মধ্যে এত কিছু !! কীভাবে মামা?' মামা বলেন 'তুই এখন ক্লাস সেভেনে উঠেছিস তোকে তোর শিক্ষক সব সুন্দর করে বুঝাবেন; আর হ্যাঁ স্যাররা যা বলবেন মেনে চলবি। আজ আর কথা বাড়াবোনা আরেক দিন কথা হবে'

পিনা খুব চিন্তায় পড়ে গেল— এক এ তো সে নতুন ইমেইল আইডি খুলেছে, এখন সে ভাবছিল সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম গুলতেও আইডি খুলবে তার বড় ভাই প্লাবনের সামাজিকমাধ্যম আইডি আছে। প্লাবন সেখানে ছবি পোস্ট দেয়। অনেকের সঙ্গে কথা বলে যোগাযোগ করে। পিনা তো এখন মহা চিন্তায় পড়ে গেল। এই কথা ভাবতে ভাবতে পিনা ঘুমিয়ে গেল। হঠাৎ তার ঘুম ভেঙে গেল দেখল তার রুমের কম্পিউটার থেকে নিল আলো আসছে। সঙ্গে সঙ্গে পিনা আনন্দে চিৎকার করে উঠল

পিনা:- 'ন্যানো তুমি এসেছো! কত্তদিন পর।'

ন্যানো মুচকি হাসছে

ন্যানো: 'হ্যাঁ পিনা, আমি দেখলাম তুমি সাইবার সিকিউরিটি নিয়ে অনেক চিন্তায় পড়ে গেছ। আমি আবার তোমার চিন্তা বুঝতে পারি আর তাই চলে এলাম সাহায্য করতে।'

পিনা: খুব ভালো করেছ ন্যানো, আমি মনে মনে তোমাকে খুঁজছিলাম। আচ্ছা বলোতো মামা যে বললেন সাইবার অপরাধ, হ্যাকিং, আমরা নাকি নিরাপদ নই এসব কী?

ন্যানো: এবার আমরা হবো সাইবার গোয়েন্দা, তুমি সব করবে আর আমি তোমাকে সাহায্য করব গোয়েন্দাগিরিতে।

সেশন ১ সাইবার অপরাধের রকমসকম

বন্ধুরা আমাদের বাস্তব জগতে যেমন অপরাধ সংঘটিত হয়, ভার্চুয়াল জগৎ মানে সাইবার স্পেসেও নানা রকম অপরাধ সংঘটিত হয়। এই অপরাধ সংঘটিত হয় নানা ডিভাইস যেমন কম্পিউটার মোবাইল ফোন, ইন্টারনেটসহ নানা প্রযুক্তি ডিভাইসের মাধ্যমে। এই সাইবারে যেমন যেমন খারাপ মানুষ রয়েছে, তেমনি আমাদের সাহায্য করার জন্য ভালো মানুষও রয়েছে। আমাদের জানতে হবে কোনোগুলো সাইবার অপরাধ, আর আমরা কাদের কাছে থেকে সাহায্য নেব এবং বিপদ থেকে দূরে থাকব।

এবার চলো, আমরা বর্তমান সময়ে ঘটছে এমন কিছু সাইবার অপরাধ সম্পর্কে জানি— প্রথমে আমরা একটি পত্রিকার সংবাদ পড়বো তারপর আমরা কিছু সাইবার অপরাধের সঙ্গে জড়িত শব্দের সঙ্গে পরিচিত হব

দৈনিক ভোরের পাখি

সাইবার অপরাধে নিরাপত্তা হুমকিতে বাংলাদেশ

বাংলাদেশও বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো সাইবার অপরাধ বাড়ছে। সাইবারে অন্যতম অপরাধ হচ্ছে মিথ্যা তথ্যকে সত্য বলে তুলে ধরা এবং গুজব ছড়ানো। এমন ঘটনা বলা যেটি বাস্তবে ঘটেইনি। মানুষ না বুঝেই অনেক বিপদে পড়ে যায়। আরেক ধরনের অপরাধ হচ্ছে হ্যাকিং (Hacking), হ্যাকিং অর্থ হলো কাউকে না বলে তার কম্পিউটারে ঢুকে পড়া। হ্যাকিং মানেই যে ক্ষতিকর কিছু কাজকর্ম হতে হবে তা ঠিক নয় । কম্পিউটারের মধ্যে থাকা কোনো সফটওয়্যারের ডিজাইনের সাধারণ পরিবর্তনকেও হ্যাকিং হিসেবে ধরা যেতে পারে। কারণ, এটি ওই সফটওয়্যার ডিজাইনের অন্তর্ভুক্ত নয়, যদিও এটি এমন কোনো শাস্তিমূলক অপরাধ নয় কিন্তু না জানিয়ে কোনো কিছু পরিবর্তন করাও হ্যাকিংয়ের মধ্যে পড়ে। সাইবার অপরাধের মধ্যে হ্যাকিং-এর পরিমাণ সব থেকে বেশি। ভাইরাস কম্পিউটারের এমন একটি সফটওয়্যার যা ব্যাবহারকারীকে না জানিয়েই অনেক ক্ষতি করতে পারে। এমন কি নিজে নিজে ইমেইল ও পাঠিয়ে দিতে পারে। এই ভাইরাস দিয়েও অনেক সাইবার অপরাধ সংঘটিত হয়। আমরা অনেক সময় মনে করি অনলাইনে কাউকে গালমন্দ করলে কেউ বুঝবে না। আসলে কিন্তু তা নয়, এটি হচ্ছে একটি সাইবার অপরাধ। এটিকে ছদ্মবেশধারী (Imposter) বলে, সাইবারে অনেক সময় মানুষ নিজের সঠিক তথ্য দেয় না এবং অন্যের নাম ও পরিচয় নিজের বলে ধারন করে এতে অনেক অপরাধ ঘটতে পারে।

সাইবারে অন্যকে যদি গালমন্দ করা হয় বা তার কোন ছবি বা বক্তব্য নিয়ে কষ্ট দেওয়া হয়, তাহলে সেটিও সাইবার অপরাধ। অন্যকে গালমন্দ করা বা কষ্ট দেওয়া (Bullying) মোটেও ভালো কাজ নয়, এটিও এক ধরনের সাইবার অপরাধ। আমাদের সাইবার অপরাধ থেকে বাঁচতে সচেতন হতে হবে।

আমরা সাইবার অপরাধ সম্পর্কে জানতে গিয়ে নতুন কিছু শব্দের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছি। চলো দেখি আমরা শব্দগুলো চেনার চেষ্টা করি

১. সাইবার নিরাপত্তা

২. সাইবার বুলিং

৩. হ্যাকিং

৪. গুজব ছড়ানো

৫.

৬.

হ্যাকিং

গুজব

সাইবার নিরাপত্তা

সাইবার বুলিং

আমরা অনেকগুলো নতুন বিষয় শিখলাম। এখন আমরা জানি, সাইবার অপরাধ কী। কিন্তু আমাদের জানতে হবে কোনোটি আসলে সাইবার অপরাধ। তাহলেই আমরা নিজেকে রক্ষা করতে পারব এবং রাষ্ট্রের সহায়তা করতে পারব সাইবার অপরাধ সম্পর্কে সচেতন হয়ে।

সেশন ২ আমরা যখন সাইবার গোয়েন্দা

বন্ধুরা, আজকে আমরা নিজেরাই হব সাইবার গোয়েন্দা, আমরা আমাদের আশপাশে ঘটে যাওয়া সাইবার অপরাধ খুঁজে বের করব। চলো এবার কাজে নামা যাক— আমাদের আশপাশে ঘটে যাওয়া একটি করে সাইবার অপরাধের ঘটনা চিরকুট লিখি- ঘটনাগুলো এমন হতে হবে যা সাইবারে ঘটেছে এবং কোনো না কোনোভাবে মানুষ এবং সমাজকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে বা নিরাপত্তা বিঘ্নিত করেছে।

নমুনা ঘটনা

ঘটনা	কোন মাধ্যমে ঘটেছে?	সাইবার অপরাধ হলে টিক চিহ্ন দিই
১. মোবাইল অ্যাকাউন্টের পিন নিয়ে টাকা আত্মসাত করেছে	মোবাইল এবং ইন্টারনেট	
২. অনুমতি ছাড়া অন্যের ব্যক্তিগত ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দিয়েছে	মোবাইল/কম্পিউটার এবং ইন্টারনেট	
৩.		
৪.		
৫.		
৬.		
৭.		
৮.		
৯.		
১০.		

সেশন ৩ রুখবো এবার সাইবার অপরাধ

পিনা এখন জানে কোনোগুলো সাইবার অপরাধ। মানুষ এতভাবে সাইবার অপরাধ করে! কিন্তু এদের ধরার কি কোনো উপায় নেই? কীভাবে এই অপরাধ থেকে বাঁচবে?

গতকালের চিন্তা ছিল সাইবার অপরাধ কী; আর আজকে রাতে তার ঘুম আসছে না কীভাবে রুখবে এই অপরাধ? ইস যদি আজকে ন্যানো আসত! পিনা ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে যায়।

'পিনা, এই পিনা ঘুম থেকে ওঠো, আমি ন্যানো, আমি এসেছি।' পিনা দেখতে পায়, তার মাথার কাছে বসে আছে ন্যানো। 'শোনো পিনা সাইবার অপরাধ দমনের জন্য অনেক ব্যবস্থা আছে, অনেক আইন আছে। বাংলাদেশেও অনেক আইন আছে, তোমার ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। আমি তোমাকে দেখাচ্ছি কী করবে।

সবার প্রথমে তোমার সঙ্গে ঘটে যাওয়া সাইবার ক্রাইম তোমার মা-বাবাকে জানাবে। তাদেরকে কাছে না পেলে পরিবারে অন্য কোনো বড় সদস্য কে জানাবে। তারপর তোমার শিক্ষককে জানাবে। পিনা, সবাই

তোমাকে সাহায্য করার জন্য আছে, তাই ভয়ের কিছু নেই; কিন্তু কিছু লুকানো যাবে না।'

এবার আমরা নিজের ছকে বিভিন্ন সাইবার অপরাধের ঘটনায় কী কী করব তা কার্টুনের শুন্য স্থানে পুরণ করব।

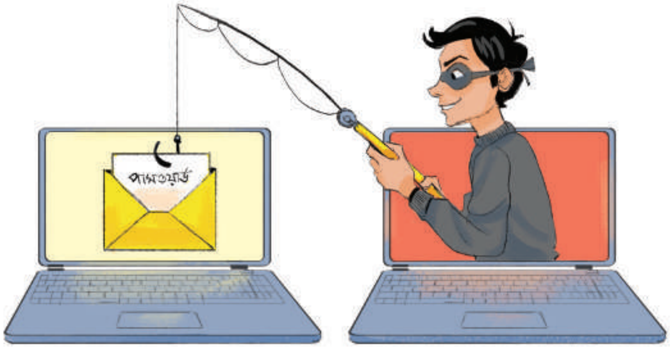

সেশন ৪ সাইবারে বিজয়

পিনার পাখির ডাকে ঘুম ভেঙে গেল। সে আজকে খুব খুশি মনে স্কুলে যাচ্ছে কারণ সে জানে সাইবার অপরাধ যেমন আছে, তা থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায়ও আছে । আজ সে শিক্ষককে অনেক কিছু জানাতে পারবে

পিনা ডিজিটাল প্রযুক্তি ক্লাসের জন্য অপেক্ষা করছিল, স্যার এসে বললেন, গতকাল আমরা অনেকগুলো সাইবার অপরাধ লিখেছিলাম। আজকে আমরা তার সমাধানে কী করণীয় তা খুঁজে বের করব। কিন্তু আমরা একাই এই কাজটি করব না। এখানে শ্রেণিকক্ষে করার পর তা বাসায় নিয়ে যাব। তারপর বাবা-মা/পরিবারের সদস্যর সঙ্গে নিয়ে সমাধান করব। তারপর ওনাদের স্বাক্ষর নিয়ে জমা দিতে হবে।

বন্ধুরা চলো আমরাও পিনার সঙ্গে কাজটি করে ফেলি—

ঘটনা	কোনো মাধ্যমে ঘটেছে?	সাইবার অপরাধে আমরা যা করব	আমার বাবা —মা পরিবারের সদস্য যা করবেন
১. মোবাইল ব্যাংক এর পিন নিয়ে টাকা আত্মসাৎ করেছে	মোবাইল এবং ইন্টারনেট		
২. অনুমতি ছাড়া অন্যের ব্যক্তিগত ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দিয়েছে	মোবাইল/কম্পিউটার এবং ইন্টারনেট		
৩. অন্যের আইডি হ্যাক করেছে			
৪. মিথ্যা / গুজব ছড়িয়েছে			
৫.			
৬.			

সেশন ৫ আমরা বানাব আমাদের সাইবার নিরাপত্তা নীতিমালা–

বন্ধুরা, এবার আমরা আমাদের নিজেদের জন্য সাইবার নিরাপত্তা নীতিমালা বানাব, যেখানে আমরা শপথ করব, সেই সকল নিরাপত্তা নিয়মকানুন আমরা নিজেরা মেনে চলব এবং স্কুলের অন্যদের জানাব যেন সবাই মেনে চলে। তারপর সেই নিরাপত্তা নীতিমালাতে সকল শিক্ষার্থীর স্বাক্ষর সংগ্রহ করে আমাদের

আমরা .... বিদ্যালয়ের ৭ম শ্রেণির ...... শাখার সকল শিক্ষার্থী শপথ করছি যে সাইবার নিরাপত্তায় আমরা নিম্নলিখিত কাজগুলো কখনোই করবো না বা অন্যকে উৎসাহিত করব না

১. নিজের নাম গোপন রেখে অন্যের সঙ্গে মোবাইল বা ইন্টারনেটে কথা বলব না।

২. অপরিচিত কারও কাছে নিজের বা পরিবারের ব্যক্তিগত তথ্য দেব না।

৩. কাউকে সাইবার জগতে গালি/মনঃকষ্ট দেব না।

৪.

৫.

৬.

৭.

নীতিমালার সঙ্গে একমত শিক্ষার্থীর স্বাক্ষর

নাম	রোল নম্বর	স্বাক্ষর

স্কুলের দেওয়ালে রেখে দেব যেন সবাই সচেতন হতে পারে। নিচের নীতিমালাটি পূরণ করব এবং সবাই মিলে যেটি তৈরি করব সেটি আলাদা কাগজ লিখবে।

শ্রেণির বাইরের কাজ— আমরা স্কুলের বড় ক্লাসের শিক্ষার্থীদের কাছে নিজদের নীতিমালা উপস্থাপন করব এবং তারা কি এই নীতিমালার সঙ্গে একমতো কিনা জানব এবং উপরের ছকের মতো করে একমতো শিক্ষার্থীদের স্বাক্ষর গ্রহণ করব। যদি কোনো বিষয়ে একমতো না হয়, সেটি নিয়ে কথা বলব এবং সবাই মিলে যেটি সঠিক সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব।

সেশন ৬ সাইবার সচেতনতায় আমরা

পিনা বাবার সঙ্গে বসে সবগুলো সমস্যার সমাধান করেছে। এখন পিনা ভাবছে এলাকার সবাই কি জানে কীভাবে সাইবারক্রাইম প্রতিরোধ করতে হয়? বাবা বলেন, এই যে তুই যেভাবে আমাকে জানালি, ঠিক সেভাবে এবার জানাবি সবাইকে। পিনা খুব চিন্তায় পড়ে গেলো কীভাবে সে সবাইকে জানাবে।

পরদিন ক্লাসে গিয়ে শিক্ষককে বিষয়টি জানাল। শিক্ষক বললেন, তোমাদের সমাজের সবাইকে জানানোর দায়িত্ব তোমাদের। তোমরা একটি নাটিকা বানাবে, যেখানে তোমরা মোবাইল ফোন দিয়ে ভিডিও করে এডিট করবে। তোমাদের মূল কাজ হবে সবাইকে জানানো সাইবার অপরাধ কী এবং কীভাবে নিরাপদ থাকা যায়। যদি মোবাইল ক্যামেরা না থাকে, তাহলেও কোনো সমস্যা নেই, তোমরা একটি নাটিকা বানিয়ে অভিনয় করবে। যেটি উপস্থাপন করা হবে সবার সামনে (শিক্ষক, পরিবারে সদস্য, সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা থাকবেন। বার্ষিক অনুষ্ঠানে উপস্থাপন করবে।

বন্ধুরা, এবার আমাদের কাজ হবে পিনার স্কুলশিক্ষক যেভাবে নির্দেশ দিয়েছেন সেভাবে একটি নাটিকা পরিকল্পনা করা। যেখানে কিছু ঘটনা থাকবে সাইবার অপরাধ হওয়ার এবং সেখান থেকে উদ্ধার পাওয়ার উপায়। এই নাটিকার মাধ্যমে আমরা আসলে সমাজের সকলকে সাইবার অপরাধ সম্পর্কে জানাব। সবাই যেন সাইবার অপরাধ থেকে নিজে নিরাপদ থাকে এবং অন্যকে নিরাপদ রাখে।

দলে ভাগ হয়ে নাটিকার পরিকল্পনাটি সংক্ষেপে লিখি

আমি "আকাশ" সেবা প্রতিষ্ঠান থেকে "বাতাস" বলছি। আপনার অ্যাকাউন্টে একটি সমস্যা হয়েছে, দয়া করে আপনার পিন নম্বরের শেষ দুটি সংখ্যা বলুন
সেবাপ্রতিষ্ঠানের ১০০% আসল কর্মী
থামুন!
ইনি একজন প্রতারক। কখনো কাউকে পিন নম্বর বা এর অংশবিশেষ বলবেন না!

শিখন অভিজ্ঞতা ৫ — আমি যদি হই রোবট

মানুষ দৈনন্দিন জীবনে কত রকম সমস্যার সম্মুখীন হয়! কিছু সমস্যার হয়তো নিয়মিত সম্মুখীন হতে হয় এবং সেটার সমাধান করতে হয়। আবার কিছু সমস্যা হয়তো নিয়মিত আসে না, কিন্তু হঠাৎ হঠাৎ উদয় হয়! আবার আমাদের সবার জীবনে কিন্তু একই রকম সমস্যার আগমন হয় না!

আগে যেকোনো সমস্যা মানুষকে নিজ হাতে সমাধান করতে হতো। এখন সমস্যার সমাধানে বিভিন্ন প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ছে। ফলে মানুষের জীবন আগের চেয়ে আরামদায়ক হচ্ছে। আমরা এই শিখন অভিজ্ঞতায় দেখব কীভাবে আমাদের চারপাশে থাকা বিভিন্ন বাস্তব সমস্যার সমাধান করার জন্য আমরা প্রযুক্তির সাহায্য নিতে পারি।

বিভিন্ন প্রযুক্তির মধ্যে রোবট এখন জনপ্রিয় হচ্ছে। কারণ, রোবট দিয়ে মানুষের প্রয়োজনীয় অনেক সমস্যার সমাধান খুব সহজেই করা যায়। রোবটকে কাজ করার জন্য নির্দেশ মানুষই শিখিয়ে দেয়।

আমরা এর আগে ষষ্ঠ শ্রেণিতে অ্যালগরিদম নিয়ে কাজ করেছিলাম। এবারে আমরা অ্যালগরিদম থেকে প্রবাহচিত্র তৈরি করব, তারপর সেই প্রবাহচিত্র থেকে রোবটের বোঝার উপযোগী সুডো কোডে রূপান্তর করব। সুডো কোড সম্পর্কে আমরা এখনও জানি না, কিন্তু এই শিখন অভিজ্ঞতা সম্পন্ন করার পর জেনে যাব। আচ্ছা, কেমন হয় যদি আমরা নিজেরাই এক একটি রোবট হয়ে যাই? রোবটের জন্য তৈরি করা সুডো কোডের নির্দেশ কি আমরা নিজেরাও বুঝতে পারব? এই শিখন অভিজ্ঞতায় আমরা নিজেরা রোবট সেজে সেই রহস্য উদঘাটনের চেষ্টা করব।

সেশন ১ – হরেক রকম বাস্তব সমস্যা

যেকোনো সমস্যা যেটা নিজেদের জীবনে মানুষ সম্মুখীন হয় সেটাই একটি বাস্তব সমস্যা। 'মেঘা' নামের একটি মেয়ে ও তার সহপাঠীরা এরকম একটি বাস্তব সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। আসো আমরা মেঘার গল্প থেকে সেটি জেনে নিই—

মেঘা সপ্তম শ্রেণির একজন শিক্ষার্থী। একদিন ক্লাসের বিরতির সময় মেঘা উদাস বসে কিছু ভাবছিল।

তখন মেঘার বন্ধু জিসান এসে বলল, 'কি রে সবাই গল্প করছে, আর তুই একা বসে বসে কী ভাবছিস?' তখন মেঘা বলল 'আচ্ছা সবাইকেই জানাব, সবাইকে আমার কাছে আসতে বলো।'

মেঘার সব সহপাঠী অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে মেঘা কী বলবে শোনার জন্য। তখন মেঘা শুরু করল, 'আমি আজ ভোরে শীতে কাঁপতে কাঁপতে সোয়েটার পরে বিদ্যালয়ে আসছিলাম। তোরা তো জানিস

কয়েক দিন ধরে কেমন ঠাণ্ডা পড়ছে! এমন সময়ে দেখলাম দু'জন মানুষ, তাদের গায়ে কোনো গরম কাপড় নেই! ঠাণ্ডায় অনেক কষ্ট হচ্ছিল ওনাদের। আমাদের আশপাশে কত মানুষ আছে যাদের গরম কাপড় কেনার আর্থিক সামর্থ্য নেই! প্রতিবছর শীতকালে তারা কত কষ্ট করেন। আমরা কি এই সমস্যা

সমাধানে কিছুই করতে পারি না?’

এই কথা শুনে মেঘার এক বন্ধু রিয়া বলল, ‘এটা তো আমি কখনও ভাবিনি। আমরা তো চাইলে একটা শীতবস্ত্র বিতরণ কর্মসূচি করতে পারি। তাহলে বেশকিছু মানুষ উপকৃত হবে যাদের এমন গরম কাপড় প্রয়োজন।’

মেঘা শুনে খুশি হয়ে বলল, ‘তাহলে তো আমাদের এখন বের করা উচিত এই কাজটা আমরা কীভাবে করব আর সেখানে আমাদের কী কী চ্যালেঞ্জ থাকবে।’

এবার আরেক বন্ধু হাশেম বলল, ‘সবার আগে চ্যালেঞ্জ হলো আর্থিক। আমাদের বেশকিছু গরম কাপড় জোগাড় করতে হবে। এ জন্য আমরা একটা প্রচারণা করতে পারি। যেন যাদের আর্থিক সামর্থ আছে তারা টাকা দিয়ে অথবা তাদের বাসায় থাকা পুরোনো ব্যবহারের উপযোগী শীতবস্ত্র দিয়ে আমাদের এই উদ্যোগে সাহায্য করতে পারেন।’

এ কথা শুনে বন্ধু নেহা বলল ‘দেখ হাশেম আমি তোর সঙ্গে একমত। কিন্তু আমাদের আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো সামাজিক অবস্থার কথা চিন্তা করা। সবার তো গরম কাপড় প্রয়োজন হবে না। আমরা ঠিক কাদের জন্য এই শীতবস্ত্র বিতরণ করব? অর্থাৎ সমাজের কোনো অংশের মানুষের জন্য আমাদের এই কর্মসূচি হবে সেটা নির্ধারণ করার জন্য আমাদের একটা জরিপ করতে হবে। সেই জরিপ থেকে আমরা বের করব সমাজের কোনো মানুষগুলোর গরম কাপড়ের অভাব আছে, তাই এই সমস্যার সমাধানে কাজ করার সময় একটা সামাজিক নির্ভরশীলতাও আছে।’

এবারে মেঘা বলল, ‘আমাদের আরও একটা ব্যাপার খেয়াল রাখতে হবে। শীতবস্ত্র সংগ্রহ করার পর ও কাদের প্রদান করা হবে সেই জরিপ করার পর আমাদের একটা ব্যবহারিক দিক নিয়ে ভাবতে হবে। যাদের জন্য শীতবস্ত্র বিতরণ করা হবে, তাদের মধ্যে সুষ্ঠুভাবে বিতরণের জন্য একটা নির্দিষ্ট স্থান নির্বাচন করতে হবে। আমরা চাইলে আমাদের বিদ্যালয় ব্যবহারের জন্যও অনুমতি নিতে পারি। বিদ্যালয়

কর্তৃপক্ষের অনুমতি নেবার পর যাদের মধ্যে আমরা শীতবস্ত্র বিতরণ করব, তাদের শীতবস্ত্র গ্রহণের দিন, সময় ও স্থান জানিয়ে দিতে হবে। এরপর নির্ধারিত দিনে বিতরণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে হবে।'

এমন সময়ে রায়হান বলল, 'আরও একটা দিক আছে। আমরা যদি বেশকিছু মানুষের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ করি, কাদের মধ্যে বিতরণ করব, তাদের তালিকা ঠিকমতো হিসাব-নিকাশ রাখতে হবে। যেন তালিকা থেকে কেউ বাদ না পড়ে আবার ভুলে একই ব্যক্তির কাছে দুইবার কাপড় বিতরণ না হয়। কাজেই এখানে একটা কারিগরি দিক আমাদের মাথায় রাখতে হবে। আমরা কাগজে-কলমে লিখে তালিকা নিয়ে কাজ করলে হিসাবে ভুল হতে পারে। তাই আমাদের উচিত একটি স্প্রেডশিট সফটওয়্যার ব্যবহার করা, যেখানে আমরা তালিকা এন্ট্রি করে রাখব ও কে কে শীতবস্ত্র নিয়ে গেল সেটি হিসাব রাখব।'

এবারে প্রিয়া বলল, 'হ্যা আমাদের শীতবস্ত্র বিতরণ কর্মসূচির বেশকিছু দিক আমরা ভেবে ফেলেছি। তবে

যেদিন আমরা বিতরণ করব, সেদিনের আবহাওয়া তথা পরিবেশের কথাও আমাদের মাথায় রাখতে হবে। আমরা আগে থেকে আবহাওয়ার পূর্বাভাস জেনে রাখব, যেন সেদিন বৃষ্টির বা অন্য কোনো কিছুর সম্ভাবনা আছে কি না, সেটা জেনে প্রস্তুত থাকতে পারি। নইলে তো পুরো শীতবস্ত্র বিতরণ কর্মসূচি বিঘ্ন হতে পারে!' মেঘা এবারে বলল, 'বন্ধুরা আমি এখন খুব খুশি। সকালে যেই সমস্যা নিয়ে আমি এত কষ্ট পাচ্ছিলাম, আমরা সবাই মিলে আলোচনা করে সেটা সমাধান করার জন্য উপায় বের করে ফেলেছি। এখন আমাদের হাতে অনেক কাজ। সবাই মিলে দায়িত্ব ভাগ করে নিই, কে কোনো কাজ করবে। আশা করি, আমরা এই কাজে সফল হবই!'

উপরে আমরা মেঘা ও তার বন্ধুদের শীতবস্ত্র বিতরণ কর্মসূচি নিয়ে জানতে পারলাম। ওরা যখন এই কর্মসূচি হাতে নিয়েছে, তখন ওদের সমস্যা সমাধানের জন্য পাঁচটি দিক নিয়েও ভাবতে হয়েছে। এগুলো হলো – অর্থনৈতিক, সামাজিক, ব্যবহারিক, কারিগরি ও পরিবেশগত দিক। সত্যি বলতে যেকোনো বাস্তব সমস্যার ক্ষেত্রেই এ রকম বেশকিছু দিক বা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন আমরা হতে পারি। তবে সব বাস্তব সমস্যার ক্ষেত্রেই পাঁচটি দিকই থাকবে এমন কিন্তু নয়! কোনো সমস্যা হয়তো শুধু একটি দিকের উপর নির্ভরশীল,

কোনোটি হয়তো একাধিক দিকের উপর নির্ভরশীল। তবে আমরা এখন থেকে যেকোনো সমস্যা নিয়ে কাজ করার সময়ে সেটি এই পাঁচটি দিকের সঙ্গে নির্ভরশীল কি না, সেটি যাচাই করে নেব, তাহলে সমাধান করতেও সুবিধা হবে। এবারে একটি কাজ করি, নতুন একটি সমস্যা নিয়ে ভাবি। ধরি, নতুন একটি অপরিচিত জায়গায় আমরা ঘুরতে যাব। এক্ষেত্রে কোনো কোনো দিকের উপর আমাদের নির্ভরশীলতা কাজ করবে? এবং সেই দিকগুলোয় ঠিক কী রকম নির্ভরশীলতা আসবে? সেটি নিচের ছকে লিখে ফেলি—

সমস্যার নাম – অপরিচিত নতুন জায়গায় ঘুরতে যাওয়া					
নির্ভরশীলতার দিক	অর্থনৈতিক	সামাজিক	ব্যবহারিক	কারিগরি	পরিবেশগত

সেশন ২ – সমস্যা সমাধানে প্রযুক্তির ব্যবহার

বিভিন্ন প্রযুক্তির ব্যবহার মানব সভ্যতার জন্য একটি আশীর্বাদ। সঠিক সময়ে সমস্যা সমাধানে সঠিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা উচিত। আমাদের চারপাশে এমন অনেক সমস্যা আছে যা আগে মানুষ নিজে নিজে সমাধান করত, কিন্তু এখন প্রযুক্তির ব্যবহারের কারণে সেটি সমাধান করা অনেক সহজ হয়ে গেছে। গত সেশনে আমরা অপরিচিত নতুন জায়গায় ঘুরতে যাওয়া নিয়ে ভেবেছি। অতীতে অপরিচিত জায়গায় ঘুরতে গেলে অবশ্যই আগে ঐ জায়গায় গিয়েছে এমন কারও থেকে সেই জায়গার ব্যাপারে ধারণা নিতে হতো। তার থেকে জেনে নিতে হতো কীভাবে আমরা সেই জায়গায় যেতে পারি, কত সময় লাগবে, কোন রাস্তার পর কোন রাস্তায় যেতে হবে ইত্যাদি।

তবে এখন এ ক্ষেত্রে সহজ সমাধান হলো কোনো ম্যাপ সফটওয়্যার ব্যবহার করা। এই ধরনের সফটওয়্যারে আমরা কোথায় আছি এবং গন্তব্য কোথায় সেটি লিখে দিলে আমাদের দেখিয়ে দেয় কত সময়ের মধ্যে আমরা পৌঁছাতে পারব,

রাস্তায় কতটুকু যানজট আছে, কোনো রাস্তা দিয়ে গেলে যেতে সুবিধা হবে, কোনো যানবাহনে উঠলে যেতে কত সময় লাগবে আরও কত কী!

আবার একই সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজন অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন প্রযুক্তির উদ্ভাবনও হয়ে থাকে! যেমন ম্যাপ সফটওয়্যার দিয়ে আমরা শুধু জানতে পারছি নির্দিষ্ট জায়গায় কীভাবে যাব। কিন্তু আমরা যদি একটি যানবাহন বুকিং করতে চাই, যেই যানবাহন দিয়ে সরাসরি নির্দিষ্ট গন্তব্যে যেতে পারব, তাহলে বিভিন্ন যানবাহন বুকিং সফটওয়্যার ব্যবহার করতে পারি। এসব সফটওয়্যারে নির্দিষ্ট যানবাহন বুকিং করা যায়, কোনো নির্দিষ্ট জায়গায় যেতে কত টাকা খরচ হবে সেই যানবাহনে সেটিও আমাদের দেখিয়ে দেয়। অর্থাৎ ম্যাপ সফটওয়্যারের থেকেও আরও বেশি সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছি। নির্দিষ্ট গন্তব্যে যাবার সমস্যাটি পুরোপুরি সমাধান হয়ে যাচ্ছে, আর কোনো চিন্তাই করতে হচ্ছে না! একইভাবে নির্দিষ্ট ওয়েবসাইট থেকে ট্রেন বা বাস বা উড়োজাহাজের টিকিট কাটার কাজও এখন সহজেই করা যায়।

আবার করোনা অতিমারির কারণে একটি নির্দিষ্ট সময়জুড়ে বাংলাদেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ রাখার প্রয়োজন হয়েছিল সকলের স্বাস্থ্য সুরক্ষার কথা বিবেচনা করে। এই সময়ে প্রযুক্তির কল্যাণেই বিভিন্ন অনলাইন সফটওয়্যার শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা যুক্ত হয়ে অনলাইন ক্লাসে অংশগ্রহণ করে।

কথায় আছে 'প্রয়োজনীয়তাই উদ্ভাবনের জনক।'

করোনা অতিমারির পূর্বে বিভিন্ন অনলাইন সভা করার সফটওয়্যারের চাহিদা তেমন ছিল না। কিন্তু করোনা অতিমারির সময় সারা পৃথিবীতেই ঘরে অবরুদ্ধ ছিল মানুষ। তাই এই সময় প্রয়োজন হয় জুম, গুগল মিট, মাইক্রোসফট টিম ইত্যাদি অনলাইন মিটিং সফটওয়্যার ব্যবহার করে অনলাইন ক্লাস, ব্যবসায়িক মিটিং ইত্যাদির আয়োজন করা। যদি এই প্রযুক্তি একটি বিকল্প হিসেবে না আসত, তাহলে করোনার সময়ে সারা পৃথিবীর অনেক কার্যক্রম স্থবির হয়ে যেতে পারত। কাজেই এ ক্ষেত্রে এই প্রযুক্তি অগণিত কাজে মানুষকে সাহায্য করেছে।

আবার অনেক সময় একটি সমস্যা সমাধানে কোনো প্রযুক্তি উদ্ভাবনের পরেও দেখা যায় সমস্যাটি সম্পূর্ণ সমাধান হয়নি বা সমাধানে কোনো ঘাটতি রয়ে গেছে। তখন সেই প্রযুক্তিকে হালনাগাদ বা আপগ্রেড করার প্রয়োজন হয়। যেমন আর্থিক লেনদেনের কথা ভাবি। আগে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় টাকা পাঠানোর প্রক্রিয়া বেশ জটিল ছিল। মানি অর্ডার করে কারও কাছে টাকা পাঠালে তার কাছে টাকা পৌঁছাতে অনেক সময় লাগত।

বর্তমানে মোবাইলের মাধ্যমেই নির্দিষ্ট টাকা লেনদেনের প্লাটফর্মের মাধ্যমে নিমেষেই দেশের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে টাকা পাঠানো যায়। তবে প্রথম যখন এই ধরনের টাকা লেনদেন সার্ভিস চালু হয়েছিল, একটি সমস্যা হতো। ধরো আমরা আমাদের ৫০০ টাকা নিজের অ্যাকাউন্ট থেকেই উত্তোলন করব। এ জন্য টাকা লেনদেনের নির্দিষ্ট এজেন্টের কাছে গিয়ে সেই এজেন্টের মোবাইল ফোন নাম্বারে প্রথমে আমাদের টাকা ক্যাশ আউটের জন্য পাঠাতে হবে।

এজেন্ট টাকা নিজের অ্যাকাউন্টে বুঝে পেলে আমাদের টাকা দিয়ে দেবেন। সমস্যা হচ্ছে যদি এজেন্টের মোবাইল ফোন নাম্বার টাইপ করার সময়ে আমরা কোনো ভুল করে ফেলি, তাহলে ঐ এজেন্টের কাছে টাকা না গিয়ে ভুল কোনো নাম্বারে টাকা চলে যাবে। এতে আমাদের ক্ষতি হবে। প্রথম দিকে মানুষ এভাবেই ভুল নম্বরে টাকা পাঠিয়ে বিপদে পড়ত।

এই সমস্যাকেও কিন্তু আবার প্রযুক্তির সাহায্যেই সমাধান করা হয়েছে! এখন যেকোনো মোবাইল নাম্বারে টাকা লেনদেনের এজেন্টের দোকানে একটি কিউআর কোড (QR Code) কোড দেওয়া থাকে। মোবাইল সেটে থাকা টাকা পাঠানোর অ্যাপলিকেশনে এই কিউ আর কোড স্ক্যান করার সুবিধা থাকে। ফলে এজেন্টের নাম্বার ভুল টাইপ করার ভয় থাকে না। কিউ আর কোড স্ক্যান করার পর সঠিক নাম্বারে টাকা পাঠানো সুনিশ্চিত থাকে।

আবার শুধু টাকা কাউকে পাঠানো বা নিজে টাকা পাবার ক্ষেত্রে এই অ্যাপলিকেশনগুলো ব্যবহার করা যায় তা কিন্তু নয়! এগুলো দিয়ে বাসাবাড়ির ইলেক্ট্রিসিটি, পানি ইত্যাদি সংযোগের বিল প্রদান করা যায়, ফলে নির্দিষ্ট অফিসে গিয়ে লাইন ধরে বিল প্রদান করার ঝামেলা কমে গেছে। একটি প্রযুক্তি প্রথমে হয়তো নির্দিষ্ট একটি সমস্যার সমাধানের জন্যই উদ্ভাবন করা হয়, কিন্তু পরে একই প্রযুক্তি আরও বিভিন্ন জায়গায় কাজে লাগানো যায়!

আমরা যেমন বেশকিছু সফটওয়্যার প্রযুক্তির কথা উপরে জানলাম, তেমনি বিভিন্ন রোবট দিয়েও এখন বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করা হচ্ছে। যেমন বিভিন্ন স্থানে যখন আগুন লাগে, আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে ও সেখান থেকে আটকে পড়া বিভিন্ন মানুষকে উদ্ধার করতে দমকল বাহিনীর সময় লাগে। পাশাপাশি আটকে পড়া মানুষ উদ্ধারে দমকল বাহিনীর যেসব কর্মী আগুন লাগা ভবনের ভিতরে প্রবেশ করেন, তাদের জীবন নিয়েও ঝুঁকি থাকে। এ রকম ক্ষেত্রে দমকল বাহিনীর সহায়তা করার জন্য বিভিন্ন ফায়ার ফাইটার রোবট ব্যবহার করা যায়।

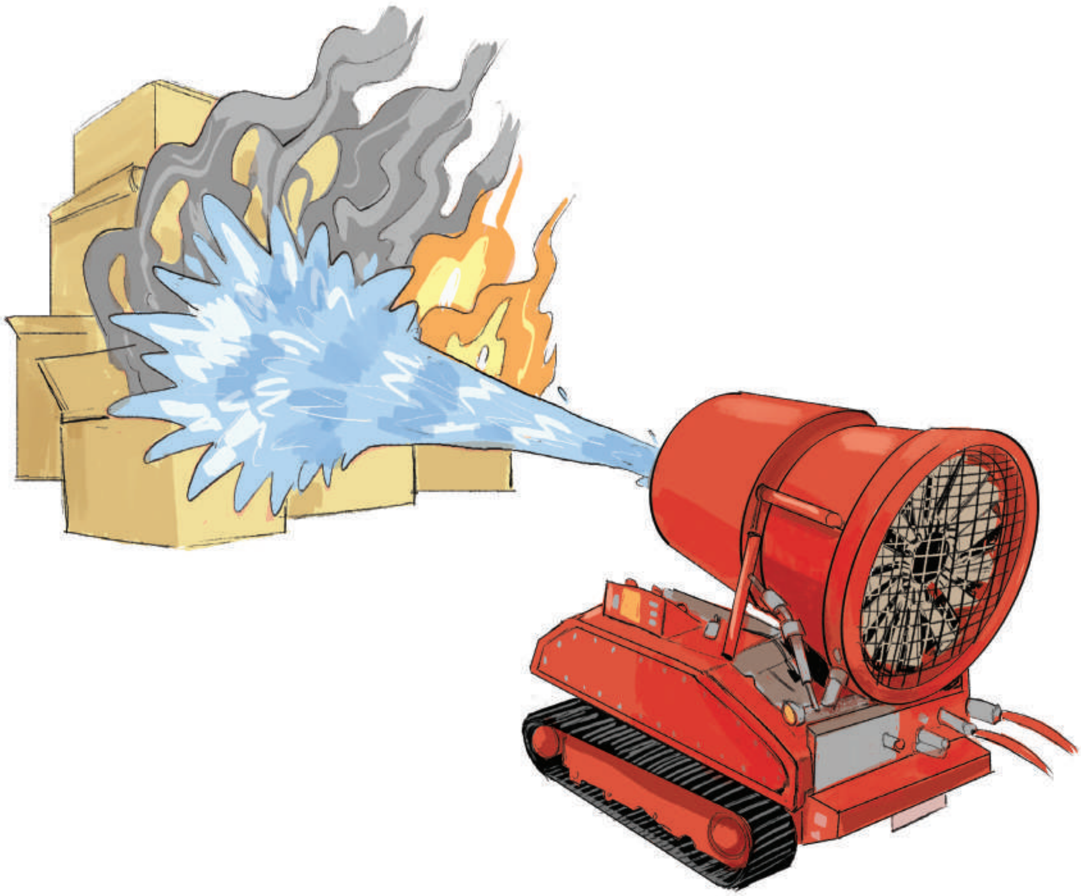

২০২২ সালে সীতাকুণ্ডে লাগা আগুন নেভানোর কাজে বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স বাহিনী প্রথমবারের মতো রোবটের ব্যবহার করে।

এ রকম আরও বিভিন্ন রোবটবিষয়ক প্রযুক্তির ব্যবহার ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এভাবে যেকোনো সমস্যার জন্যই আমরা প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে সমাধানের উপায় বের করতে পারি।

আগামী সেশনের প্রস্তুতি

বাসায় গিয়ে আমরা কিছু বাস্তব সমস্যা খুঁজে বের করার চেষ্টা করব, যেই সমস্যাগুলো বিভিন্ন প্রযুক্তি ব্যবহার করে সমাধান করা সম্ভব। বিশেষ করে কোনো নির্দিষ্ট রোবট দিয়ে সমাধান করা যাবে এমন সমস্যাগুলো তুমি খুঁজে বের করার চেষ্টা করতে পারো।

এমন পাঁচটি সমস্যার কথা নিচের ছকে লিখে ফেলি—

১.

২.

৩.

৪.

৫.

সেশন ৩ – সমস্যা সমাধানের অ্যালগরিদম বানাই

আমরা বাসায় গিয়ে বেশকিছু সমস্যার তালিকা তৈরি করেছিলাম যে সমস্যাগুলো প্রযুক্তির মাধ্যমে সমাধান করা সম্ভব। এবারে আমরা একটি সমস্যা নির্বাচন করে সেটি সমাধানের ধাপগুলো অর্থাৎ অ্যালগরিদম লিখব। তার আগে নিচের কাজগুলো সম্পন্ন করতে হবে—

১. শিক্ষক পুরো ক্লাসের সবাইকে নিয়ে মোট ছয়টি ভিন্ন দলে ভাগ করে দেবেন।

২. প্রতিটি দলের সকল সদস্য নিজেদের লেখা বিভিন্ন সমস্যা যেগুলো প্রযুক্তি দিয়ে (বিশেষ করে কোনো রোবট দিয়ে) সমাধান করা যায় সেগুলোর তালিকা একসঙ্গে করবে।

৩. এবারে নিজেরা মিলে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেবে একটি সমস্যা বাছাই করতে। এই সমস্যা নিয়েই পরবর্তী সেশনগুলোতে আমরা কাজ করব।

৪. সমস্যা নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা দলের একাধিক শিক্ষার্থীর তালিকায় ছিল সেটিকে প্রাধান্য দেওয়া যেতে পারে।

৫. এবারে নির্বাচন করা সমস্যা সমাধানের ধাপগুলো অর্থাৎ অ্যালগরিদম আলোচনা করে লিখে ফেলি। মনে রাখতে হবে, অ্যালগরিদম এমনভাবে লিখতে হবে যেন একটি রোবটকে সেই অ্যালগরিদম দিলে অ্যালগরিদমের ধাপগুলো অনুসরণ করে রোবটটি পুরো কাজটি করে ফেলতে পারে।

যেমন আমরা এর আগে আগুন নেভানোর জন্য রোবটের ব্যবহার সম্পর্কে জেনেছিলাম। তুমি যদি আগুন নেভানোর একটি রোবট হতে তাহলে তোমার কাজ করার অ্যালগরিদম কেমন হতো?

এ ক্ষেত্রে আমাদের অ্যালগরিদম হবে পরের পাতার মতো —

সমস্যা – আগুন নেভানোর জন্য রোবট ব্যবহার করা

অ্যালগরিদম –

১ম ধাপ। প্রথমে রোবট চালু করি;

২য় ধাপ। রোবটের ক্যামেরা দিয়ে সামনের অবস্থা দেখি;

৩য় ধাপ। যদি দেখি কোথাও আগুন দেখা যাচ্ছে না তাহলে ৪র্থ ধাপে চলে যাই। আর যদি দেখি সামনে আগুন দেখা যাচ্ছে, তাহলে রোবটের পাইপ দিয়ে পানিপ্রবাহ করি, আগুন না নেভা পর্যন্ত পানি ঢালতে থাকি।

৪র্থ ধাপ। কাজ শেষ ।

এবারে নিজেদের দলের নির্বাচন করা সমস্যার বিষয়বস্তু ও সমাধানের অ্যালগরিদম লিখে ফেলি—

সমস্যা—

অ্যালগরিদম—

সেশন ৪—চল প্রবাহচিত্র বানাই

এর আগে ষষ্ঠ শ্রেণিতে আমরা প্রবাহচিত্র (Flow Chart) তৈরি করা দেখেছিলাম। তবে সেগুলো ছিল খুবই সরল প্রবাহচিত্র। কোনো যন্ত্রকে প্রোগ্রাম করার বা নির্দেশনা বুঝিয়ে দেবার জন্য মূলত দুটি ধাপ আছে। প্রথমটি প্রবাহচিত্র তৈরি করা; যেন আমাদের নির্দেশনাগুলো যন্ত্রের বোঝার উপযোগী হয়, এরপর সেই প্রবাহচিত্র অনুযায়ী প্রোগ্রাম লিখতে হয়।

প্রবাহচিত্র আঁকার সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো ছবি দেখেই একনজরে পুরো নির্দেশনার ধাপগুলো সহজে বোঝা যায়। ফলে যন্ত্রকে পুরো নির্দেশনা বোঝানো সহজ হয়।

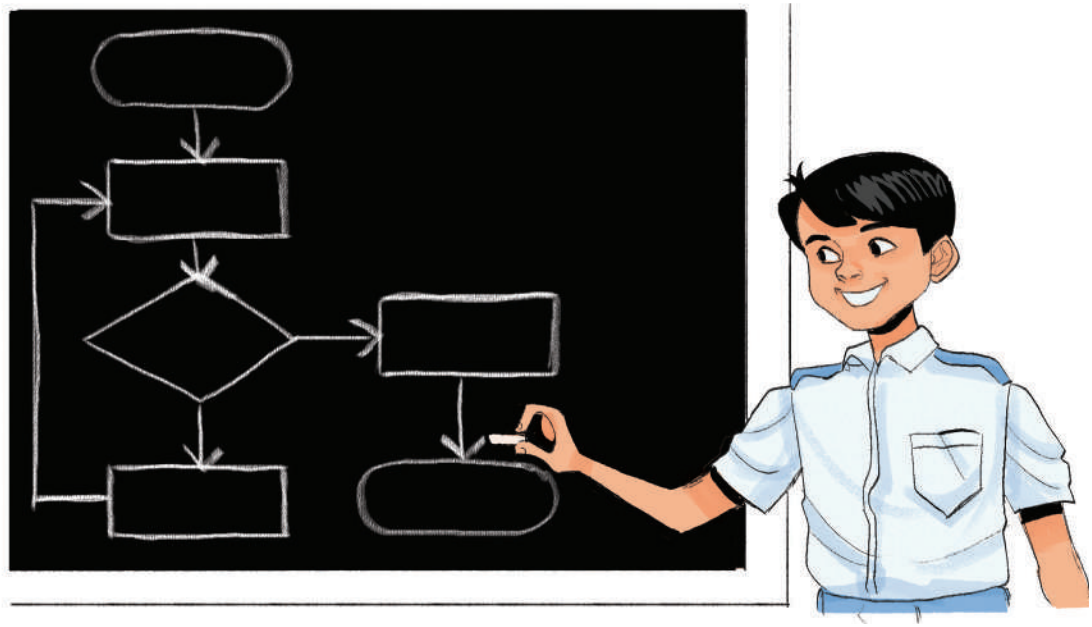

আবার যদি আবার নির্দেশনার ধাপে কোনো ভুল থাকে, সেটি সব সময় অ্যালগরিদম থেকে সহজে শনাক্ত করা যায় না। কিন্তু সেই তুলনায় প্রবাহচিত্র থেকে সহজে এ রকম ভুল ধরা যায় যে পুরো নির্দেশনার কোনো অংশে কী ভুল হচ্ছে।

আবার নির্দেশনায় কোনো পরিবর্তন আনার ক্ষেত্রেও প্রবাহচিত্র ব্যবহার করলে পরিবর্তন আনা সহজ হয়। তবে প্রবাহচিত্রের কোনো সমস্যা থাকে না তা-ও নয়।

আমাদের তৈরি করা নির্দেশনার ধাপ যদি অনেক বেশি জটিল হয়, তাহলে পুরো নির্দেশনা প্রবাহচিত্রে উপস্থাপন করা বেশ কঠিন হয়ে যাবে। এ জন্য নির্দেশনার ধাপ অনেক বেশি জটিল হলে তখন প্রবাহচিত্র ব্যবহার সব সময় সম্ভব হয় না।

আমরা ষষ্ঠ শ্রেণিতে যে সরল প্রবাহচিত্রগুলো দেখেছিলাম, সেখানে মূলত তীর চিহ্ন দিয়ে পুরো নির্দেশনার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সরলরৈখিকভাবে বিভিন্ন নির্দেশনা দেখানো হয়েছিল; যা একটি অ্যালগরিদম থেকে খুব বেশি ভিন্ন নয়।

কিন্তু একটি প্রবাহচিত্রে শুরু ও শেষের মাঝে বিভিন্ন রকম পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে। কোনো নির্দিষ্ট তথ্য ইনপুট বা আউটপুট দিতে হতে পারে, কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন হতে পারে, অন্য কোনো কাজ সম্পাদন করা প্রয়োজন হতে পারে ইত্যাদি।

ইনপুট আর আউটপুট শব্দ দুটি তুমি কি কখনও শুনেছ? ইনপুট মানে হলো বাইরে থেকে কোনো তথ্য গ্রহণ করা। যেমন ধরি আমি চোখ দিয়ে একটা সাদা বিড়াল দেখতে পাচ্ছি। বিড়াল কিন্তু আমার চোখের বাইরে ছিল। বিড়ালটির রং কী সেই তথ্য আমার চোখ গ্রহণ করেছে। বিড়ালের রং সাদা— এই তথ্যটি হলো চোখের ইনপুট।

আবার বাইরের জগতে কোনো কাজ করে দেখালে সেটা হলো আউটপুট। যেমন তুমি যখন মুখ দিয়ে কথা বলো, মুখ থেকে শব্দ তৈরি হয়ে বাইরে যায়। এই যে শব্দ বা তথ্য বাইরে গেল মুখ থেকে, এই তথ্যটি হলো মুখের আউটপুট।

আমরা যন্ত্রের বোঝার উপযোগী যেই প্রবাহচিত্র তৈরি কর ব, সেখানে বেশকিছু প্রতীক আমাদের ব্যবহার করতে হবে-

প্রতীক	অর্থ	বিস্তারিত
	শুরু/শেষ	একটি কাজের শুরু বা শেষ বুঝাতে এই প্রতীক ব্যবহার করা হয়।
	প্রসেস	একদম বেসিক কোনো প্রসেস বা ধাপ দেখানোর সময় এই প্রতীক ব্যবহার করা হয়।
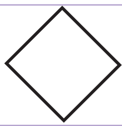	সিদ্ধান্ত	যেকোনো সিদ্ধান্ত নেবার সময় এই প্রতীক ব্যবহার করা হয়।
	ইনপুট/ আউটপুট	কোনো ডাটা ইনপুট নেবার জন্য বা আউটপুট প্রদানের জন্য ব্যবহার করা হয়।
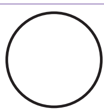	সংযোগকারী	প্রবাহচিত্রে এক ধাপের সঙ্গে অন্য ধাপকে একসঙ্গে যুক্ত করা প্রয়োজন হলে এই প্রতীক ব্যবহার করা হয়।
	প্রবাহের দিক	এই দিক দিয়ে একটি ধাপের পর কোনো ধাপ অনুসরণ হচ্ছে সেটি বোঝা যায়।

এর বাইরেও আরও বিভিন্ন প্রতীক আছে প্রবাহচিত্র আঁকার জন্য। সেগুলো পরবর্তী শ্রেণিসমূহে প্রয়োজন হলে তখন আমরা শিখে নেব।

এখন আবার আগের সেশনে শিখে আসা রোবট দিয়ে আগুন নেভানোর অ্যালগরিদমের কথা ভাবি।

তুমি যদি নিজে একটি আগুন নেভানোর রোবট হতে, তাহলে আগে তৈরি করা অ্যালগরিদমকে আমরা প্রবাহচিত্রে রূপান্তর করলে দেখতে কেমন হবে?

সমস্যা—আগুন নেভানোর জন্য রোবট ব্যবহার করা

প্রবাহচিত্র –

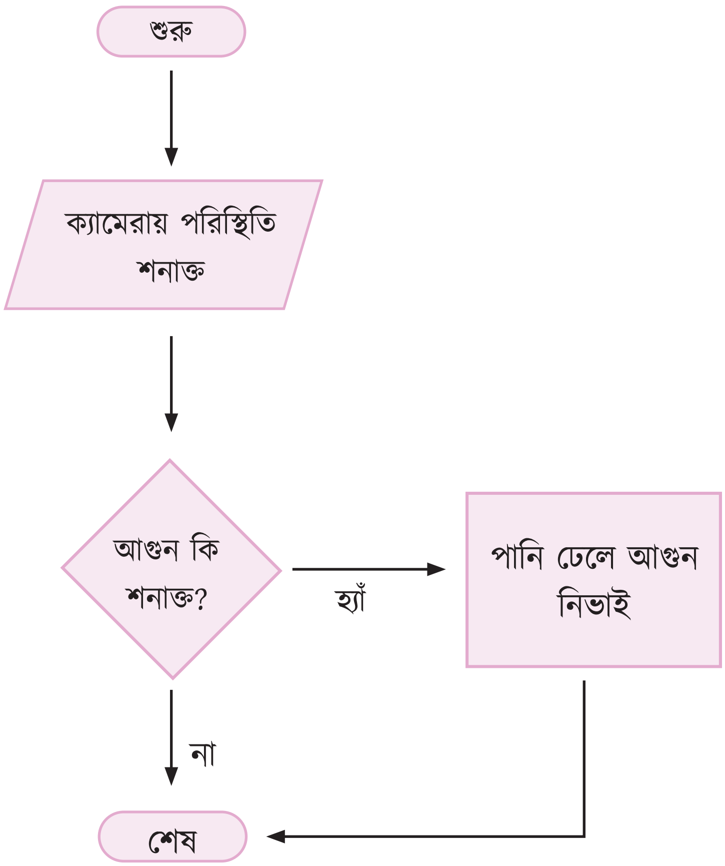

সেশন ৫ নিজেদের তৈরি অ্যালগরিদমকে প্রবাহচিত্রে রূপান্তর

আমরা এর আগে দেখেছি কীভাবে অ্যালগরিদম থেকে সহজেই প্রবাহচিত্রে রূপান্তর করা যায়। প্রবাহচিত্রে অ্যালগরিদমের মতো এত বিস্তারিত নির্দেশনা লেখার প্রয়োজন হয়নি।

বরং আমরা যে বিভিন্ন প্রতীক ব্যবহার করছি তার কারণেই বোঝা যাচ্ছে কোন ধাপে কোন কাজ হচ্ছে। এবারে আমরা নিজেরা দলগতভাবে যে সমস্যা নির্ধারণ করেছিলাম, সেই সমস্যা থেকে তৈরি করা আমাদের অ্যালগরিদমকে প্রবাহচিত্রে রূপান্তর করব।

আমাদের তৈরি করা অ্যালগরিদমে নিশ্চয়ই বেশকিছু ধাপ আছে। কাজের সুবিধার্থে প্রথমে আমরা নির্ধারণ করে নিই কোন কোন ধাপে আমরা ইনপুট নিয়েছি বা আউটপুট দিয়েছি, কোন কোন ধাপে কী রকম সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ও কোন কোন ধাপে শুধু সাধারণ তথ্য প্রসেস করা হয়েছে।

এরপর প্রবাহচিত্র সেই অনুযায়ী আমরা আঁকব—

সমস্যা –
বিভিন্ন ইনপুট / আউটপুট—
বিভিন্ন সিদ্ধান্তের ধাপ—

বিভিন্ন সাধারণ কাজ—

আমাদের প্রবাহচিত্র —

সেশন ৬ যন্ত্র বুঝুক কথা

আগের সেশনে আমরা নিজেদের সমস্যার সমাধান নিয়ে প্রবাহচিত্র তৈরি করেছি। তবে কোনো যন্ত্রকে সরাসরি আসলে প্রবাহচিত্র ধরিয়ে দেওয়া হয় না। যন্ত্রকে নির্দিষ্ট কোনো প্রোগ্রাম অথবা কোড লিখে দিতে হয় যেখানে কাজের ধাপগুলো যন্ত্রের বোঝার উপযোগী করে লেখা থাকে।

এই যে নির্দিষ্ট প্রোগ্রাম বা কোড আমরা তৈরি করব, যন্ত্রের বোঝার জন্য, সেটি প্রবাহচিত্র অনুসরণ করেই করব। তবে চাইলে সরাসরি অ্যালগরিদম থেকেও কোড তৈরি করা সম্ভব। কিন্তু যন্ত্র আসলে আমাদের নির্দেশ বোঝে কীভাবে? প্রথমতো একটি যন্ত্র (কম্পিউটার, রোবট ইত্যাদি) আসলে সরাসরি আমাদের মুখের ভাষা বুঝতে পারে না। সেটি ইংরেজি, বাংলা ইত্যাদি যে ভাষায়ই হোক না কেন! যন্ত্র আসলে বোঝে শুধু দুটি সংখ্যা— ০ আর ১। এই দুটিকে বলা হয় বাইনারি ডিজিট।

এই ০ ও ১ বাইনারি সংখ্যার মাধ্যমেই যন্ত্র সব নির্দেশনা বোঝে। যেমন আমাদের বাংলা ভাষায় ৫০টি বর্ণ, সেই ৫০টি বর্ণ দিয়ে আমাদের বোঝার উপযোগী অগণিত শব্দ ও বাক্য তৈরি হয়। তেমনি যন্ত্রের বোঝার মতো সকল নির্দেশনা তৈরি হয় ১ ও ০ দিয়ে শুধু! ০ আর ১ এর সমন্বয়ে গঠিত এসব নির্দেশ বা কোডকে বলা হয় মেশিন কোড। কিন্তু আমরা তো মেশিন কোড বুঝি না। অনেকগুলো ০ আর ১ কে একসঙ্গে দেখলে আমাদের কাছে শুধু হিজিবিজি মনে হবে! তাহলে আমরা কীভাবে যন্ত্রের সঙ্গে যোগাযোগ করব? সেটার জন্য আছে বিভিন্ন প্রোগ্রামিং ভাষা, যেমন— সি, পাইথন, পার্ল, জাভা, স্ক্র্যাচ ইত্যাদি।

সাধারণত একটা প্রোগ্রামিং ভাষায় কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণ করে মানুষের বোঝার উপযোগী (যেমন ইংরেজি বা বাংলা ইত্যাদি) ভাষায় করে যন্ত্র বুঝতে পারে এমন করে নির্দেশনা লেখা হয়। এরপর সেই নির্দেশ যন্ত্রের কাছে পাঠানো হলে যন্ত্র সেটিকে খুব সহজে মেশিন কোডে রূপান্তর করে নেয় ও নির্দেশ অনুসরণ করে কাজ করে। প্রশ্ন আসতে পারে কোনো প্রোগ্রামিং ভাষাটি শিখব?

আসলে যেকোনো একটি প্রোগ্রামিং ভাষা শিখে যন্ত্রকে নির্দেশ দেওয়া শুরু করা যেতে পারে। একটি শেখা গেলে তারপর অন্যগুলো শেখা অনেক সহজ হয়ে যাবে আমাদের জন্য। আমরা এখনই সরাসরি নির্দিষ্ট কোনো প্রোগ্রামিং ভাষা শিখতে যাচ্ছি না। তার পরিবর্তে যেকোনো প্রোগ্রামিং ভাষায় সহজে রূপান্তর করা যাবে এমন সুডো কোড (pseudo code) আমরা তৈরি করা শিখব।

সুডো কোড জিনিসটা কী? সুডো মানে হলো অনুরূপ বা ছদ্ম।

মূলত সুডো কোড হচ্ছে অ্যালগরিদমকে মানুষের বোঝার উপযোগী ভাষায় এমনভাবে সংকেত বা কোড আকারে প্রকাশ করা, যেটি থেকে সহজেই যেকোনো প্রোগ্রামিং ভাষায় পুরো নির্দেশমালাকে রূপান্তর করা যাবে।

তবে খেয়াল রাখতে হবে সুডো কোড কিন্তু সত্যিকারের একটি প্রোগ্রাম নয়। তাই কোনো প্রোগ্রামিং ভাষায় না লিখে শুধু সুডো কোড লিখে দিলে যন্ত্র সেটি বুঝতে পারবে না। সুডো কোড যেকোনো সময়ে যেকোনো প্রোগ্রামিং ভাষায় রূপান্তর করা যায়, এটাই সবচেয়ে বড় সুবিধা।

আমরা যদি আমাদের রোবট দিয়ে আগুন নিভানোর প্রবাহচিত্রকে সুডো কোডে রূপান্তর করতে যাই, তাহলে কিছু জিনিস ভেবে নিতে হবে।

প্রথমতো, সকল ইনপুট বা আউটপুটকে নির্দিষ্ট চলক (ক, খ, গ ইত্যাদি) দিয়ে প্রকাশ করতে হবে। আবার কোনো সিদ্ধান্ত নেবার সময় 'যদি' ও 'অন্যথায়' দিয়ে প্রকাশ করব।

আর কোনো কাজ সম্পন্ন করার সময় (যেমন আগুন নিভাচ্ছি) সেটাকে একটা ফাংশন হিসেবে () চিহ্ন দিয়ে :

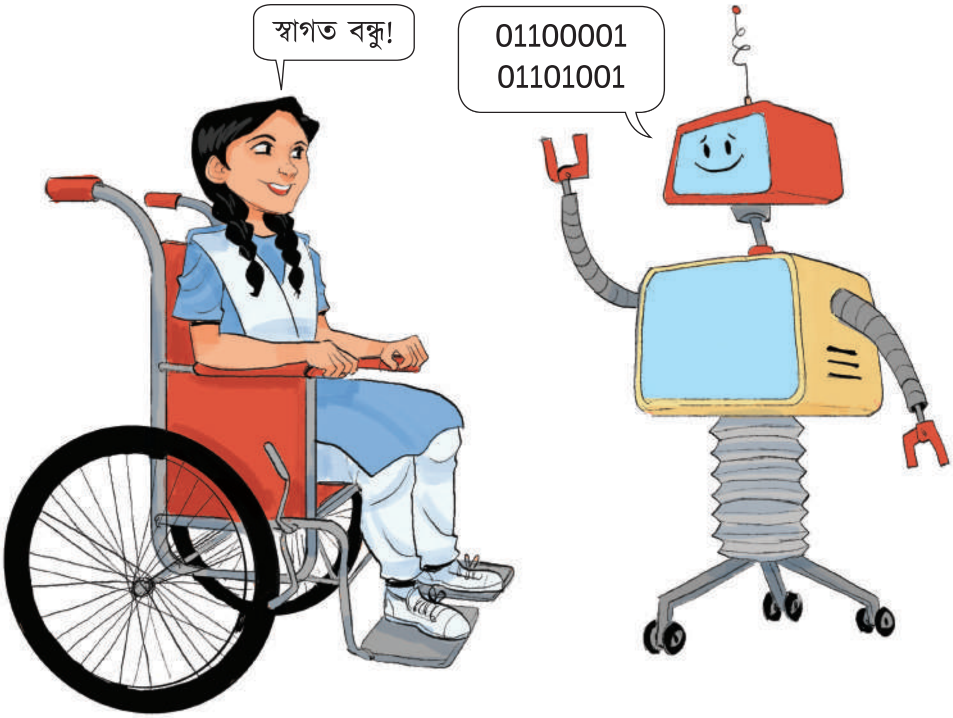

ফাংশন মানে হলো নির্দিষ্ট কিছু ধাপ অনুসরণ করে নির্ধারিত একটি কাজ শেষ করা।

যেমন আগুন নিভানোর ফাংশন হতে পারে আগুন নিভাই()

সুডো কোডটি দেখতে এমন হবে—

```
শুরু
ক = ক্যামেরা
যদি ক = হ্যাঁ হয়, আগুন নিভাই () এরপর শেষ
অন্যথায় শেষ
```

তাহলে কত সহজে একটি সুডো কোড দিয়ে আমরা পুরো কাজটি দেখিয়ে দিলাম!

এবারে আমরা একইভাবে নিজেদের দলের তৈরি করা প্রবাহচিত্রকে সুডো কোডে রূপান্তর করে ফেলি—

সেশন ৭– কাগজ দিয়ে রোবট বানাই

আমরা এই শিখনফলে একটি বাস্তব সমস্যা নিয়ে কাজ করা শুরু করে সেটিকে সমাধানের জন্য অ্যালগরিদম তৈরি করেছি, প্রবাহচিত্র তৈরি করেছি ও সুডো কোড তৈরি করেছি। কিন্তু সুডো কোড তৈরি করলাম কার জন্য? একটি যন্ত্রকে দিয়ে সমস্যার সমাধান করার জন্য তো তাই না?

তাহলে একটা যন্ত্র বা রোবট না বানালে কীভাবে চলে! এবারে আমরা একটি রোবট তৈরি করব কাগজ কেটে। আর এজন্য আমরা ব্যবহার করব প্রবাহচিত্রের বিভিন্ন প্রতীককে! পরের পৃষ্ঠায় আমাদের এই জন্য একটি প্রবাহচিত্র তৈরি করাই আছে! সেটিকে অনুসরণ করে আমরা এই রোবট তৈরি করব!

প্রয়োজনীয় উপকরণ — কাঁচি ও আঠা।

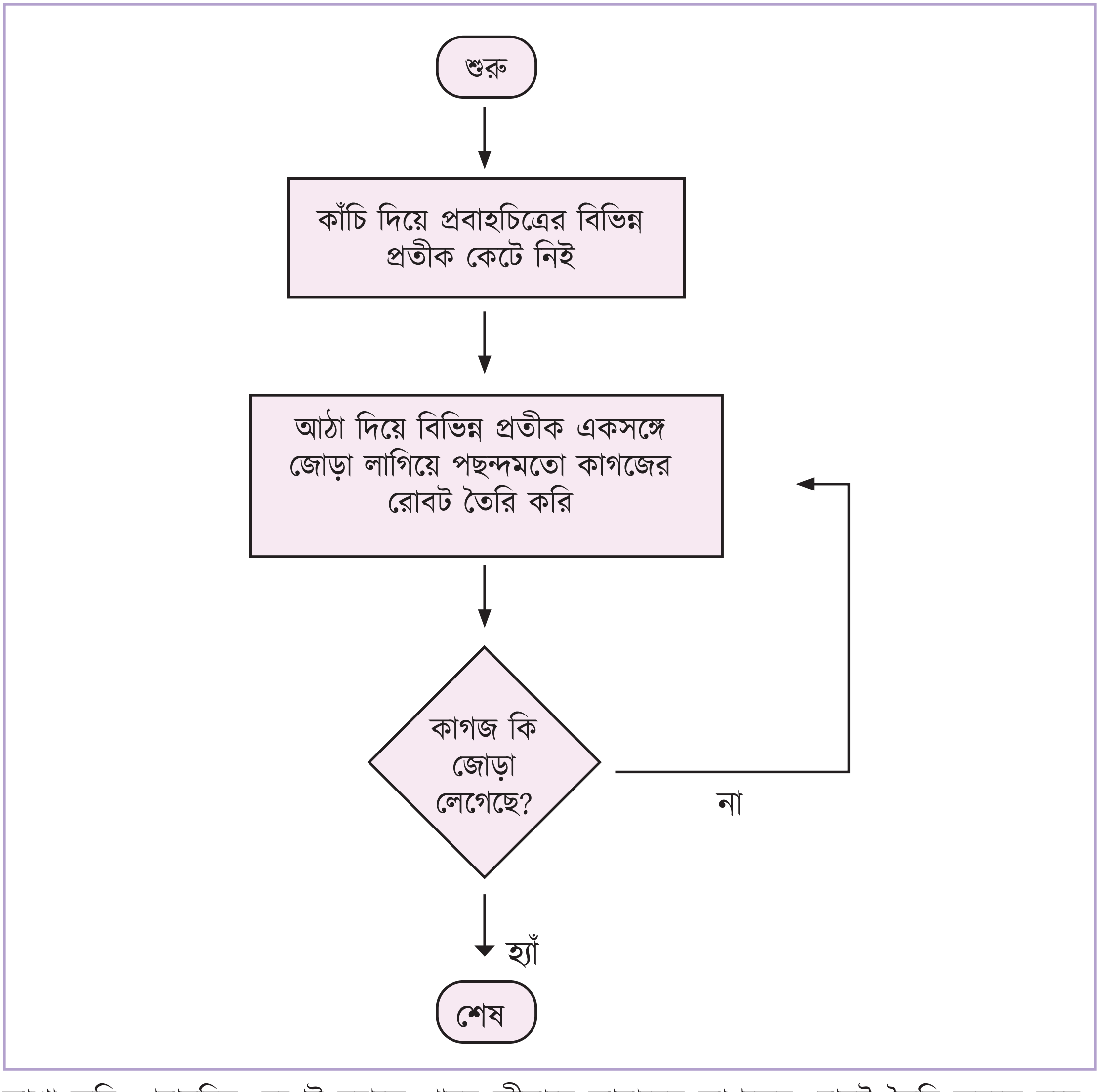

আশা করি, প্রবাহচিত্র দেখেই বুঝতে পারছ কীভাবে আমাদের কাগজের রোবট তৈরি করতে হবে। এখানে একই প্রতীক একাধিক দেওয়া আছে। পছন্দমতো যে প্রতীক যতগুলো খুশি ব্যবহার করে

দলগতভাবে নিজেদের পছন্দমতো কাগজের রোবট তৈরি করে ফেলো।

মজার জিনিস হচ্ছে আমরা নিজেরা এই কাজটা করছি, তাই এই প্রবাহচিত্রে দেয়া নির্দেশনা অনুসরণ করে পছন্দমত প্রতীক কেটে কাগজের রোবট তৈরি করে নিচ্ছি। তবে কম্পিউটার নিজে এমনভাবে পছন্দমত প্রতীক আলাদা করে নিতে পারতো না। এমন করার জন্য কম্পিউটারকে আগে থেকে শিখিয়ে নিতে হয় কোনটা কি প্রতীক ও দেখতে কেমন হয়

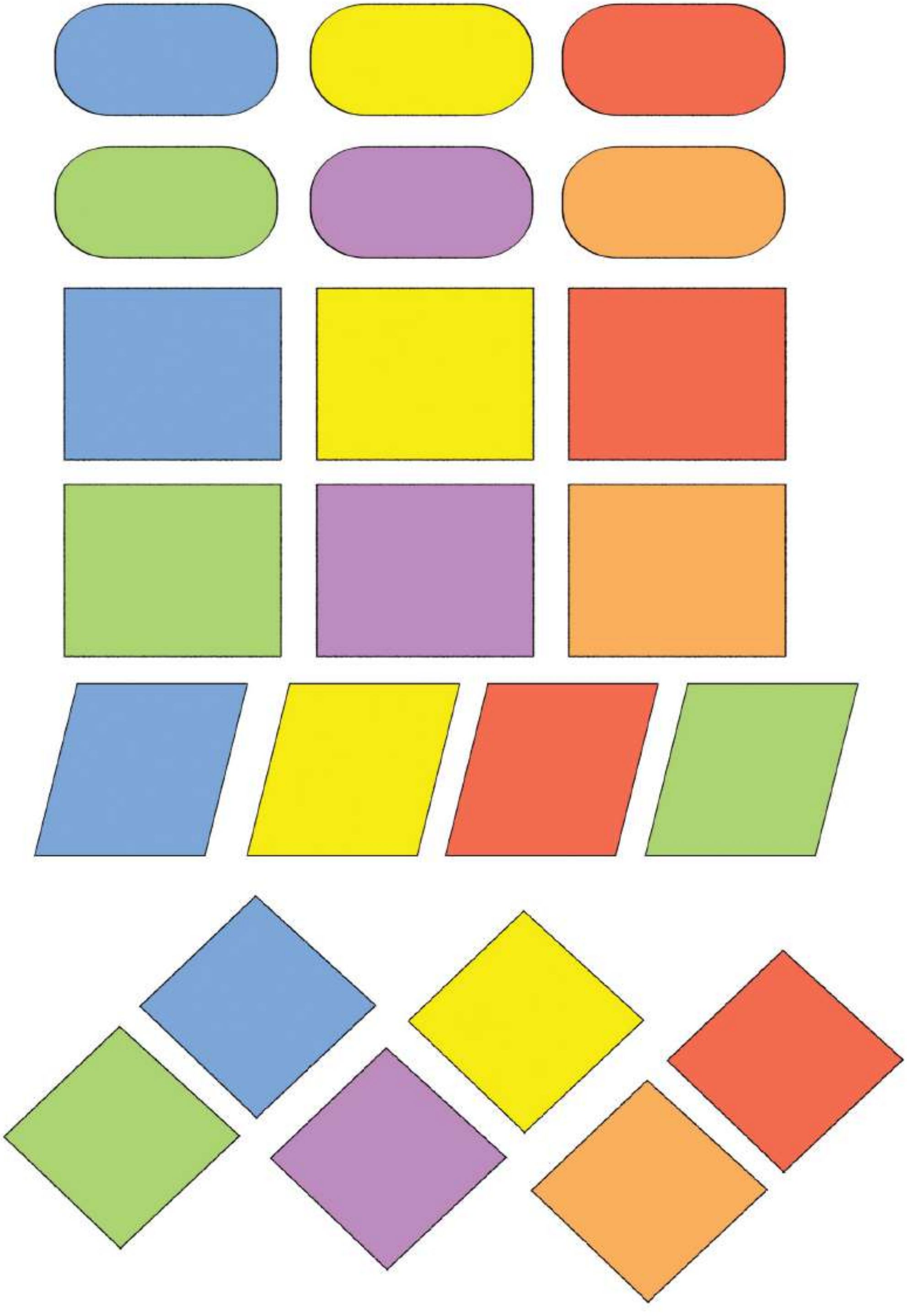

আগের পাতার প্রতীকগুলো কেটে নিজেদের মত রোবট বানাই

সেশন ৮ রোবটে সুডো কোড চালাই

গত দুটি সেশনে আমরা নিজেদের নির্বাচন করা সমস্যার সমাধান থেকে সুডো কোড তৈরি করেছি এবং পাশাপাশি একটি কাগজের রোবট তৈরি করেছি প্রবাহচিত্র অনুসরণ করে।

কিন্তু আমাদের তৈরি করা সুডো কোড ঠিক আছে কি না বা সেটি আসলেই রোবটের বোধগম্য হয়েছে কি না, সেটি তো যাচাই করতে হবে!

তাই এবারে আমরা একটি খেলা খেলব রোবটে সুডো কোড চালানোর জন্য। প্রথমেই আমরা এই খেলার নিয়ম জেনে নিই-

১. দুটি করে দল পরস্পর মুখোমুখি হবে। তাদের হাতে নিজেদের তৈরি করা সুডো কোড ও নিজেদের দলের কাগজের রোবট থাকবে।

২. এবারে শুরু হবে মজার খেলা।

একটি দল তাদের তৈরি সুডো কোড অন্য দলটির কাছে হস্তান্তর করবে। পাশাপাশি কোনো সমস্যার সমাধানের জন্য সুডো কোডটি তৈরি করা হয়েছিল সেটিও কাগজে লিখে দেবে।

৩. অন্য দলের কাছ থেকে পাওয়া সুডো কোড পাবার পর আমরা রোবটের অভিনয় করব। নিজেকে রোবট হিসেবে চিন্তা করব।

৪. আমি যদি রোবট হতাম, তাহলে আমার কাছে থাকা বর্তমান সুডো কোড অনুসরণ করে কি নির্ধারিত সেই সমস্যা আসলেই সমাধান করতে পারতাম?

সেটি যাচাই করে দেখব আমরা।

৫. সুডো কোডে দেওয়া প্রতিটি ধাপ অনুসরণ করে কাজটি সফলভাবে সম্পন্ন করতে পারলে তখন নিচের ছক পূরণ করে ফেলব —

প্রশ্ন	যাচাই (হ্যাঁ বা না লিখি)
পুরো সুডো কোড কি বুঝতে পেরেছি?	
সুডো কোড অনুসরণ করে পুরো কাজ কি করা গেছে?	
সুডো কোডে কোন নির্দিষ্ট ইনপুট বা আউটপুট কি পেয়েছি?	
সুডো কোডে কোথাও কি কোনো সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে?	
আমাদের কি মনে হয় এর চেয়ে আরও কম ধাপে পুরো সুডো কোড সম্পন্ন করা যেত?	

সুডো কোডে এমন কোন ধাপ কি বাদ পড়েছে যেটা অবশ্যই প্রয়োজনীয় ছিল?	

৬. এই ছকের অধিকাংশ ধাপের উত্তর যদি সন্তোষজনক হয়, তাহলে অন্য দলটিকে অভিনন্দন জানাই। আর আমাদের দলের তৈরি করা কাগজের রোবট উপহার হিসেবে অন্য দলটিকে প্রদান করি।

তাহুলে সব দলই যদি সফলভাবে সুডো কোড সম্পন্ন করে থাকে, প্রতিটি দলই নিজের দলের তৈরি করা কাগজের রোবটের পরিবর্তে নতুন একটি কাগজের রোবট উপহার পাবে!

কি দারুণ না?

এভাবে আমরা কিন্তু যেকোনো বাস্তব সমস্যার সমাধানের জন্যই প্রযুক্তির সাহায্য নিতে প্রয়োজনীয় অ্যালগরিদম, প্রবাহচিত্র ও সুডো কোড তৈরি করতে পারি।

প্রয়োজনে যেকোনো সময় শিক্ষকের পরামর্শও নিতে পারি এই কাজগুলো করার জন্য।

শিখন অভিজ্ঞতা ৬ বন্ধু নেটওয়ার্কে ভাব বিনিময়

ষষ্ঠ শ্রেণিতে আমরা জেনেছিলাম নেটওয়ার্ক কী, কীভাবে কাজ করে। আমরা একটি নেটওয়ার্ক ও বানিয়েছিলাম। এবার আমরা নেটওয়ার্ক নানা ধরন জানব, অতীতে কেমন ছিল এখন কেমন হচ্ছে সেটি দেখব। এবার আমরা তারবিহীন নেটওয়ার্ক কীভাবে শুরু হয়েছে, তার সঙ্গে যে আমাদের ইতিহাস জড়িয়ে আছে তা জানব। পিনা আর ন্যানোর কথা মনে আছে নিশ্চই। আমরা ওদের সঙ্গেও অনেকগুলো কাজ করব।

সেশন ১ ইতিহাস থেকে অতীতের নেটওয়ার্ক জানি

আজকে পিনার মন ভালো নেই। অনেক দিন তার ন্যানোর সঙ্গে যোগাযোগ হচ্ছে না। সে ভাবছে যদি এমন কোনো পথ থাকত যা দিয়ে ন্যানোর সঙ্গে যোগাযোগ করা যেত। মামার সঙ্গে যোগাযোগ করতে গিয়ে ইন্টারনেটের সম্পর্কে জেনেছে; কিন্তু সেটা তো তারযুক্ত নেটওয়ার্ক। তারের মাধ্যমে সংযোগ; কিন্তু এখন যদি তার না থাকে। এই যে আমরা তার ছাড়া মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করি। কীভাবে সম্ভব? এভাবে যদি ন্যানোর সঙ্গেও যোগাযোগ করা যেত। পিনা এমন ভাবতে ভাবতে ছাদে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। এমন সময় দূর থেকে সে ডাক শুনতে পাচ্ছে 'পিনা, এই পিনা, আমি চলে এসেছি' পিনা চোখ খুলেই দেখে ন্যানো তার দিকে তাকিয়ে হাসছে।

পিনা: 'আরে ন্যানো, এত্তদিন পর তুমি এলে? তোমাকে কত খুঁজেছি। কোনোভাবেই তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারিনি। তুমি তো কম্পিউটারের ভিতরে ছিলে, বেরিয়ে এলে কী করে?"

ন্যানো: 'আমি অন্য গ্রহে আমার মামার বাড়িতে ঘুরতে গিয়েছিলাম, সেখানে তুমি যোগাযোগ করতে পারছিলে না। দূর গ্রহের সঙ্গে যোগাযোগ করতে অনেক তরঙ্গশক্তির প্রয়োজন হয়।

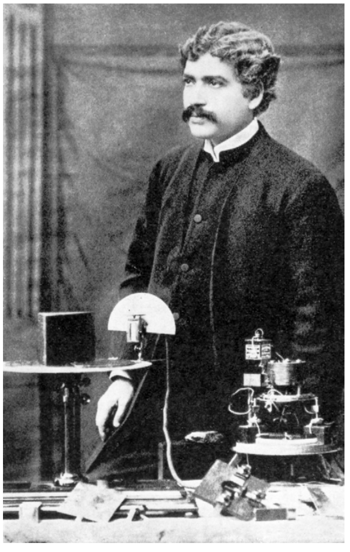

পিনা: 'ন্যানো, কী যে সব কঠিন শব্দ বলো না তুমি! এগুলো তো আমি কিছুই বুঝিনা। আমি শুধু জানি, নেটওয়ার্ক দুই রকম তারবিহীন আর তারযুক্ত তুমি তো আমাকে তাই শিখিয়েছিলে গতবার'।

ন্যানো: 'হুম এবার তোমাকে আরও ভালো করে শিখাব। এবং তোমাদের বন্ধুদের নিয়ে তোমরা নিজেদের একটা নেটওয়ার্ক বানাবে।

—জানো পিনা, প্রথম বিনা তারের যোগাযোগ যারা শুরু করেছিলেন, তাদের মধ্যে একজন কিন্তু তোমার দেশের একজন বিজ্ঞানী তিনি হচ্ছেন জগদীশ চন্দ্র বসু। তিনিই প্রথম মাইক্রোয়েভ এর মাধ্যমে এক ঘর থেকে আরেক ঘরে তারবিহীন ভাবে যোগাযোগ স্থাপন করেন সেই ১৮৯৭ সালে।

এই আবিষ্কারের সময় অন্যান্য দেশগুলোতেও অনেক বিজ্ঞানী বিনা তারের সাহায্য যোগাযোগ করার চেষ্টা করছিলেন, যার মধ্যে সফল হন ইতালির বিজ্ঞানী Guglielmo Marconi সেখান থেকে অন্য বিজ্ঞানীরাও গবেষণা করতে থাকেন, আবিষ্কার হয় রেডিও। যা যোগাযোগে আনে এক অসাধারণ পরিবর্তন।'

প্রতিকী ছবি: সৌজন্যে তারেক মাসুদ মেমোরিয়াল ট্রাস্ট

রেডিওর মাধ্যমে অনেক দূরে তথ্য পাঠানো যায় । আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সকল সংবাদ পাওয়া যেত রেডিও থেকে। ১৫ আগস্ট ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নৌবহরে একসঙ্গে আক্রমন করেন মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর-১০-এর নৌ-কমান্ডোরা। তারা কিন্তু একসঙ্গে আক্রমণ করেছিলেন সেই সময় আকাশবাণী তে প্রচার হওয়া একটি গান।

এই গান রেডিওতে যখনি বেজে ওঠে তখনি আক্রমণ শুরু হয়। এটি ছিল আক্রমণের গোপন সংকেত।

পিনা: 'বাহ কী চমৎকার! তারবিহীন যোগাযোগে তো অনেক সুবিধা।' পিনা অবাক হয়ে শোনে

পিনা: 'আচ্ছা ন্যানো এই যে বিনা তারে এভাবে যোগাযোগ করে, সেটি আসলে হয় কী করে?'
ন্যানো: 'এগুলোর প্রতিটাই আসলে নানা ধরোনের তরঙ্গ। তোমার শিক্ষক তোমাদেরকে বড় ক্লাসে উঠলে সব বুঝিয়ে দেবেন। হয়তো তোমরাও এই ব্যাপারে নতুন অনেক কিছু আবিষ্কার করবে।

হঠাৎ পিনা শুনতে পায় কে যেন দূর থেকে ডাকছে, 'এই পিনা, পিনা! খেলতে যাবিনা?' আরে ন্যানো যে মিলিয়ে যাচ্ছে, সেখানে হাজির হলো পিনার বান্ধবী রিনি। পিনা বুঝতে পারে সে আসলে স্বপ্ন দেখছিল; কিন্তু কি সুন্দর একটা স্বপ্ন ছিলো!

আচ্ছা, বন্ধুরা আমরা পিনা আর ন্যানোর গল্প থেকে তারবিহীন নেটওয়ার্ক সম্পর্কে জানলাম। আমাদের চারপাশে কি এমন তারবিহীন নেটওয়ার্ক আছে? একটু খুঁজে দেখি তো আমাদের শ্রেণি কক্ষের মধ্যে বা আমাদের স্কুলে তারবিহীন নেটওয়ার্ক আছে কিনা। নিচের ছকটি পূরণ করি।

স্কুলের মধ্যে তারযুক্ত নেটওয়ার্ক	স্কুলের মধ্যে তারবিহীন নেটওয়ার্ক
টেলিফোন	মোবাইল

আগামী সেশনের প্রস্তুতি এবার আমরা আমাদের বাড়ির চারপাশে কী কী ধরনের নেটওয়ার্ক আছে এবং সেগুলো কোথা থেকে কোথায় গেছে দেখে আসব।

সেশন ২–আমার চারপাশের আছে নানা ধরনের নেটওয়ার্ক

আমরা আমাদের চারপাশের বিভিন্ন যন্ত্র পর্যবেক্ষণ করে দেখি কোনোটি তাঁরের সাহায্যে এবং কোনোটি বিনা তারের সাহায্যে তথ্য আদান-প্রদান করে।

যন্ত্র	তথ্য পাঠানোর মাধ্যম	আমার কোনো পর্যবেক্ষণ
মোবাইল ফোন	তারবিহীন	তথ্য গ্রহণ ও প্রেরণ
রেডিও	তারবিহীন	শুধু তথ্য গ্রহণ

আমরা এবার খুঁজে বের করি নেটওয়ার্কগুলো কীভাবে কাজ করে। আমাদের তারযুক্ত এবং তারবিহীন নেটওয়ার্কের জন্য দুটি দলে বিভক্ত হই, একদল তারবিহীন নেটওয়ার্কের সুবিধা ও অসুবিধা এবং অপর দল তারযুক্ত নেটওয়ার্কের সুবিধা-অসুবিধা খুঁজে বের করি এবং নিচের ছকে উপস্থাপন করি।

দল-১ তারযুক্ত নেটওয়ার্ক		তারবিহীন নেটওয়ার্ক	
সুবিধা	অসুবিধা	সুবিধা	অসুবিধা

আগামী সেশনের প্রস্তুতি

এবার আমরা আমাদের বাড়ির যেকোনো একটি নেটওয়ার্কের চিত্র এঁকে আনব। সেখানে ষষ্ঠ শ্রেণিতে আমরা যেমন ভ্রমণ পরিকল্পনা করেছিলাম, সেরকম যেকোনো একটি নেটওয়ার্ক আঁকব, কিন্তু এটি আমার বাড়ির আশপাশের কোনো নেটওয়ার্ক হবে ।

সেশন ৩ চলো নেটওয়ার্ক দিয়ে তথ্য পাঠাই

আগের সেশনে আমরা বিভিন্ন তারযুক্ত ও তারবিহীন নেটওয়ার্ক খুঁজে বের করেছি। নেটওয়ার্কগুলোর মূল কাজ তো হল এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় তথ্যের আদান প্রদান করা। কিন্তু এই কাজ আসলে কীভাবে হয়? এইযে কিছু নেটওয়ার্কে তারযুক্ত থাকে, সেই নেটওয়ার্কে তথ্য ওই তার দিয়ে কীভাবে যায়? আবার কিছু নেটওয়ার্কে তো তারও থাকে না! তাহলে সেই নেটওয়ার্ক দিয়েই বা কীভাবে তথ্য যায়? বেশ অবাক লাগছে তাই না ব্যাপারটা ভাবতে?

একেক নেটওয়ার্ক আসলে একেক পদ্ধতিতে কাজ করে। আমরা খুব সাধারণ দুইটি নেটওয়ার্কে তথ্য বিনিময় সম্পর্কে জেনে নেই।

তারযুক্ত নেটওয়ার্ক হিসাবে টেলিফোন যেভাবে অন্য টেলিফোনের কাছে তথ্য আদান প্রদান করে-

প্রথমে আমাদের বুঝতে হবে আমরা টেলিফোন দিয়ে কীরকম তথ্য পাঠাচ্ছি। আমরা যখন টেলিফোনে কথা বলি, তথ্য হিসাবে শব্দকে পাঠাই অন্য টেলিফোনের কাছে। টেলিফোনের হ্যান্ডসেটে একটা মাইক্রোফোন থাকে। মাইক্রোফোনের কাজ হল আমাদের বলা শব্দগুলোকে ইলেকট্রিক সিগন্যালে রুপান্তর করা। ইলেকট্রিক সিগন্যাল মূলত একধরণের বৈদ্যুতিক তরঙ্গ, যা তারের মধ্য দিয়ে একস্থান থেকে আরেক স্থানে পাঠানো যায়। টেলিফোনের যে তারের লাইন থাকে সেটার ভিতর আসলে তামার তার থাকে। তামা একটি ধাতু যা খুব সহজে তড়িৎ পরিবহন করতে পারে। তাই তামার তারের মধ্য দিয়ে মাইক্রোফোনে রুপান্তর হওয়া ইলেকট্রিক সিগন্যাল সহজেই অপর পাশে পাঠানো যায়। অন্য যে টেলিফোনে বৈদ্যুতিক তরঙ্গ গ্রহণ হবে সেখানে থাকে একটা লাউডস্পিকার। লাউডস্পিকার অন্য প্রান্ত থেকে আসা ইলেকট্রিক সিগন্যালকে রুপান্তর করে আবার শব্দে পরিণত করে। তখন আমরা সেই শব্দ লাউডস্পিকারে শুনতে পাই।

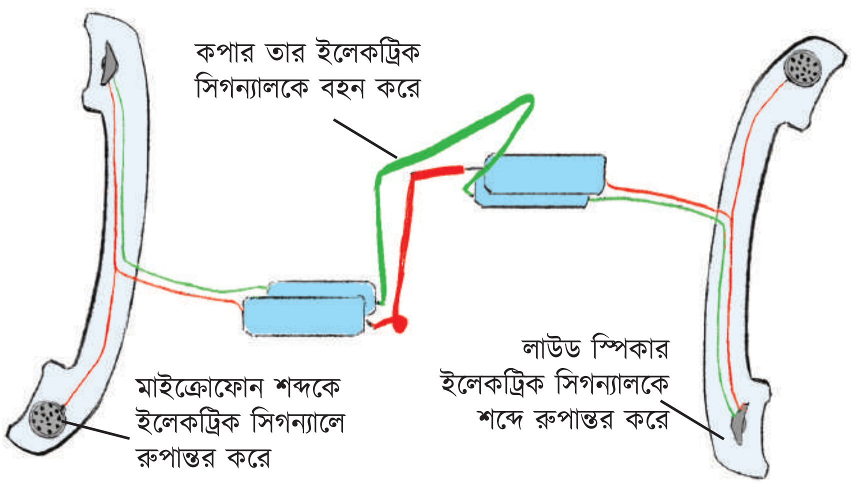

তাহলে আমাদের তারযুক্ত নেটওয়ার্কের তথ্য আদান প্রদানের মূল কাজগুলো কি হল একটু আবার দেখে নেই-

ক) যে ডিভাইস থেকে তথ্য যাবে সেখানে একটি উপকরণ থাকবে যা তথ্যকে পাঠানোর মত

একটি মাধ্যমে রুপান্তর করল

খ) রুপান্তরিত তথ্য একটি তারের মাধ্যমে যেই ডিভাইসে পৌঁছানোর কথা সেখানে গেল।

গ) যেই ডিভাইস তথ্য গ্রহণ করল রুপান্তরিত তথ্যকে আবার আগের অবস্থায় ফেরত নিয়ে আসল।

টেলিফোনের পাশাপাশি অন্য সব তারযুক্ত নেটওয়ার্কই এই সাধারণ পদ্ধতি সচরাচর অনুসরণ করে তথ্যের আদান প্রদান করে।

এবারে চল একটা কাজ করা যাক। আমরা তো ষষ্ঠ শ্রেণিতে অ্যালগোরিদমের মাধ্যমে একটি কাজ করার ধাপগুলো লেখা শিখেছি।

টেলিফোনের মাধ্যমে তথ্য আদান প্রদানের ধাপগুলো নিয়ে চল একটি অ্যালগোরিদম নিচে লিখে ফেলি-

১ম ধাপ – একটি টেলিফোনে কথা বলি

২য় ধাপ – আমার বলা কথা মাইক্রোফোন দিয়ে ইলেকট্রিক সিগন্যালে রুপান্তরিত হল

এবার চল তারবিহীন নেটওয়ার্কে কীভাবে তথ্য আদান প্রদান হয় সেটাও একটু ধারণা নেয়া যাক। তারযুক্ত নেটওয়ার্কে যেহেতু টেলিফোনের কথা আলোচনা হল, আসো এখন আমরা মোবাইল ফোন কীভাবে তথ্য পাঠায় তা জেনে নেই।

আমরা এর আগে রেডিও তরঙ্গ সম্পর্কে জেনেছিলাম। আমাদের মোবাইল ফোন যখন তথ্য পাঠায় তখন রেডিও তরঙ্গের মাধ্যমেই সেটা পাঠায়। প্রতিটি মোবাইল ফোনে একটি রেডিও তরঙ্গ পাঠানোর ও গ্রহণ করার এনটেনা থাকে। মোবাইলে যখন আমরা কথা বলি তখন মোবাইল থেকে চারপাশে এই এনটেনা দিয়ে রেডিও তরঙ্গের মাধ্যমে সেই তথ্য ছড়িয়ে পরে। মোবাইল এর এই তথ্য গ্রহণ করার জন্য নেটওয়ার্ক টাওয়ার থাকে। নেটওয়ার্ক টাওয়ার

এই তথ্য গ্রহণ করে যেই মোবাইলে ওই তথ্য পাঠিয়ে দেয়া দরকার সেখানে আবার পাঠিয়ে দেয়। ওই মোবাইল ফোন তখন নিজের এনটেনা দিয়ে আবার সেই তথ্য গ্রহণ করে। তাহলে তারবিহীন নেটওয়ার্কে তথ্য আদান প্রদানের মূল পদ্ধতি নিচের মত-

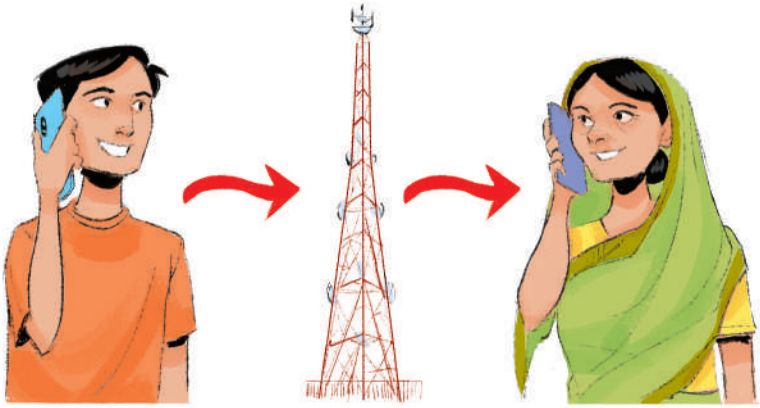

ক) প্রথমে একটি ডিভাইস থেকে তথ্য পাঠালাম

খ) রেডিও তরঙ্গের মাধ্যমে সেই তথ্য একটি নেটওয়ার্ক টাওয়ারের কাছে গেল

গ) নেটওয়ার্ক টাওয়ার থেকে আবার রেডিও তরঙ্গের মাধ্যমে তথ্য গ্রাহক ডিভাইসের কাছে চলে গেল

বেশিরভাগ তারবিহীন নেটওয়ার্ক এই সাধারণ পদ্ধতি অনুসরণ করেই চলে।

চল মোবাইল ফোনের মাধ্যমে তথ্য আদান প্রদানের ধাপগুলো নিয়ে একটি অ্যালগোরিদম লিখে ফেলি নিচে-

আমরা এখানে খুব সরল উপায়ে দুইটি তারযুক্ত ও তারবিহীন নেটওয়ার্কে তথ্যের আদান প্রদান সম্পর্কে জানলাম। বাস্তবে কিন্তু নেটওয়ার্কগুলো আরো জটিল উপায়ে কাজ করে। যখন আমরা আরো বড় হব তখন নেটওয়ার্কে তথ্যের আদান প্রদান নিয়ে আরো বিস্তারিত জানতে পারব।

সেশন ৪ আমাদের নিজেদের নেটওয়ার্ক রাখবো নিরাপদ

বন্ধুরা, গত বছর আমরা বিদ্যালয় শিখন নেটওয়ার্ক বানিয়েছিলাম। এবার আমরা সেই বিদ্যালয় শিখন নেটওয়ার্ককে আরও নিরাপদ করব। ধরো তুমি তোমার বন্ধু রাহাতের জন্মদিনে তাকে অবাক করে দেওয়ার জন্য আরেক বন্ধু তারেকের সঙ্গে মিলে একটি উপহার বানাচ্ছ। তুমি চাও পরিকল্পনাটি শুধু তোমার এবং তারেকের মধ্যেই থাকে। কোনোভাবেই যেন রাহাত বুঝতে না পারে। এখন তুমি কীভাবে তোমাদের এই বিষয়টি গোপন রাখবে এবং কাজটি করবে? নিশ্চয় কোনো গোপন সংকেতের মাধ্যমে। আমাদের বন্ধু নেটওয়ার্কের নিরাত্তার জন্য আমরা এমন একটি নিরাপদ পদ্ধতি ব্যবহার করব।

এবারে আমাদের বন্ধু নেটওয়ার্কের কাজ হবে আমাদের সকল প্রয়োজনীয় বাড়ির কাজ এবং অন্যান্য সকল জরুরি তথ্য নিজেদের মধ্যে গোপনীয়ভাবে পাঠানো।

আচ্ছা, আমরা আগে জেনে নিই কীভাবে নেটওয়ার্কের মধ্যমে তথ্য নিরাপদ রেখে পাঠানো যায়। প্রত্যেক নেটওয়ার্কের রয়েছে কিছু গোপন সংকেত। এই সংকেত যদি আরেকটি যন্ত্র না জানে, তাহলে সেই নেটওয়ার্কে প্রবেশ করতে পারবে না। নির্দিষ্ট যন্ত্র যদি সেই গোপন সংকেতটি জানে, তাহলেই সেই নেটওয়ার্কে প্রবেশ করতে পারবে। তাই তথ্য গোপন করে পাঠানো খুব গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণত সরকারি-বেসরকারি গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যবহৃত নেটওয়ার্কগুলো অনেক বেশি নিরাপত্তাযুক্ত করা হয়, যেন অন্য কেউ গোপনীয় তথ্য পেয়ে না যায় এবং ক্ষতি না করতে পারে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বিনা তারে গোপন তথ্য আদান প্রদান করা হতো। জার্মানি ও তাঁর বন্ধুরাষ্ট্র এবং মিত্রশক্তির মধ্যে জয়পরাজয় নির্ধারিত হয়েছিল এরকম গোপন বার্তার অর্থ উদ্ধারের মাধ্যমে। বড় ক্লাসে উঠলে তোমরা আরও ভালোভাবে জানবে ।

আমরা গত বছর নেটওয়ার্কের বিভিন্ন অংশ যেমন প্রেরক, প্রাপক, সার্ভার, রাউটার ইত্যাদি সম্পর্কে জেনেছিলাম, এবার আমাদের তৈরি নেটওয়ার্কের সঙ্গে সেই অংশগুলোর তুলনা করব। কিন্তু মনে রাখতে হবে, আমরা যেন নেটওয়ার্কের গোপনীয়তা ঠিক রাখতে পারি।

গোপনীয়তা রক্ষায় আমরা নিচের খেলাটি খেলব-

এটি অনেকটা ফুলটোক্কা খেলার মতো, যেখানে আমরা আমাদের বন্ধুদের কোনো একটি গোপন নাম দিয়ে ডাকি এবং তারপর চোখ বন্ধ করে রাখা আরেকটি বন্ধুর কপালে টোক্কা দিতে বলি, তারপর চোখ বাঁধা বন্ধুটির কাজ হয় সেই ছদ্ম নামে ডাকা বন্ধুকে খুঁজে বের করা।

প্রথমে আমরা ছয়টি দলে বিভক্ত হই। আমরা চারটি দল দুটি করে গোপন তথ্য পাঠাব আরেক দলের কাছে। আর বাকি দুটি দল হবে হ্যাকার। ওই দুই দল তথ্য চুরি করে জানতে চাইবে। কীভাবে গোপনীয় বার্তা পাঠাতে হয়, তার জন্য দরকার আমাদের এনকোড অর্থাৎ তথ্যকে গোপন করা ও ডিকোড অর্থাৎ গোপন তথ্যকে উদ্ধার করা। সেটি আমরা করব বিভিন্ন বর্ণকে একটির জায়গায় আরেকটি প্রতিস্থাপন করে। এখন পরের পাতার ছকটি ভালো করে দেখো

প্রকৃত অক্ষর	ক	খ	গ	ঘ	ঙ
প্রতিস্থাপিত অক্ষর	ট	ছ	জ	ঝ	ঞ

এরূপ প্রতিস্থাপন করে তোমরা কোড করলে। এখন ‘কাকা’ শব্দটি হয়ে যাবে ‘টাটা’ যা অন্য দলের জন্য বোঝা অনেক কঠিন হবে। এভাবেই মূলত বিভিন্ন নেটওয়ার্কের সাহায্যে তথ্য গোপন করে পাঠানো হয়।

তোমাদের কাজ হবে এমন করে বার্তা লিখবে যেটি অন্য দল বুঝতে না পারে। প্রতিটি দলের বার্তা হ্যাকার দলের কাছে তিন মিনিট করে থাকবে। এর মধ্যে যদি তারা অর্থ উদ্ধার করতে না পারে, তাহলে যেই দলটি বার্তা লিখছিল তারা জিতবে।

বন্ধুরা, এখন আমরা বুঝতে পারলাম নেটওয়ার্কের নিরাপত্তা কীভাবে দেওয়া হয়। আমরা এবার নিজেরা বের করব কীভাবে নেটওয়ার্ক নিরাপদ রাখে।

নেটওয়ার্ক নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তা

নেটওয়ার্কের নিরাপত্তা খুব গুরুত্বপূর্ণ। এর মাধ্যমে আমরা তথ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারি। যেকোনো প্রতিষ্ঠানের তথ্য নিরাপদ রাখতে হলে সেই নেটওয়ার্ককে নিরাপদ রাখতে হবে, যেন খারাপ মানুষের হাতে সেই তথ্য চলে না যায়। হ্যাকাররা অনেক সময় তথ্য নিয়ে অনেক ক্ষতি করতে পারে। যেমন ধর কোনো ব্যাংক এর নেটওয়ার্কের তথ্য নিয়ে টাকা আত্মসাৎ করল। আবার কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ফলাফল পরিবর্তন করল, অন্য কারও মোবাইল ফোনের কথা শুনে ফেলল এবং সেটি দিয়ে ক্ষতি করল। এরকম আরও নানা কারণে আমাদের নেটওয়ার্ককে নিরাপদ রাখতে হয়।

আগামী সেশনের প্রস্তুতি আমরা ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে যেভাবে বিদ্যালয় শিখন নেটওয়ার্ক ও অভিভাবক নেটওয়ার্ক বানিয়েছি সেভাবে একটি নেটওয়ার্ক বানাব (প্রয়োজনে ষষ্ঠ শ্রেণির ডিজিটাল প্রযুক্তি বইয়ের ছয় নম্বর অভিজ্ঞতা দেখে নিতে পারো) ।

সেশন ৫ তারবিহীন স্যাটেলাইট নেটওয়ার্ক

বন্ধুরা তোমরা কি বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের নাম শুনেছ? এটি হচ্ছে বাংলাদেশের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ। এটি আমাদেরকে তথ্য আদান প্রদানে ব্যাপক সহায়তা করে। এটি মহাকাশে তাঁর কক্ষপথে এক অবস্থানে থেকে ঘুরছে এবং তথ্য পাঠাচ্ছে। অনেক সময় আমরা মোবাইল, ঘড়ি, জিপিএস (GPS- Global Positioning System) -এর মাধ্যমে আমাদের অবস্থান বের করতে পারি। এই অবস্থান বের করা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ এখনকার প্লেন, জাহাজ, গাড়ি সঠিক পথ খুঁজে পাওয়ার জন্য সাটেলাইট থেকে তথ্য নেয়। এটিও একটি তারবিহীন নেটওয়ার্ক। আমরা এবার বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের অবস্থান দেখব তার পর সেটি থেকে আমাদের স্কুলের অবস্থান কোথায় সেটি বের করব।

আমরা এবার নিচের মানচিত্রে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটি চিহ্নিত করব এবং সেই সঙ্গে সেটি কীভাবে তথ্য আদান-প্রদান করে সেটি নিজেরা আঁকব। আমাদের মানচিত্রে আমরা আমাদের স্কুলের অবস্থান চিহ্নিত করব তারপর সেখান থেকে আমরা বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের অবস্থান সংযুক্ত করব।

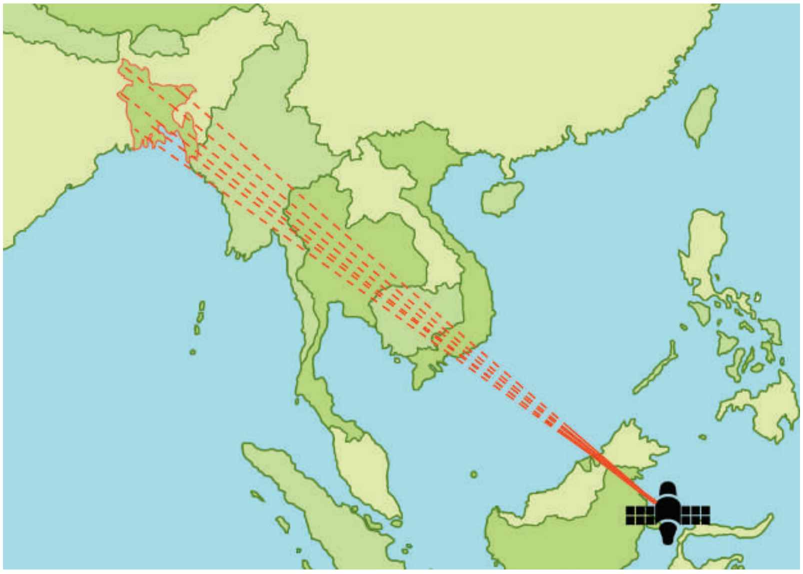

আমরা দেখতে পেলাম স্যাটেলাইটের অবস্থান কোথায় এবং আমাদের অবস্থান কোথায়। স্যাটেলাইট হচ্ছে বিনা তারের যোগাযোগ করার আরেক ধরনের নেটওয়ার্ক; যেটি আমাদেরকে তথ্য আদান-প্রদান করে সাহায্য করে। দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় অবস্থান খুঁজে বের করার জন্যও স্যাটেলাইট ব্যবহৃত হয়।

ব্যক্তিগত কাজে স্যাটেলাইট	ব্যবসা ক্ষেত্রে সাটেলাইট

আগামী সেশনের প্রস্তুতি আমরা আমাদের নিজেদের জীবনের কোন কোন কাজে স্যাটেলাইট নেটওয়ার্ক ব্যবহার করি, তা খুঁজে বের করব।

সেশন ৬ আমাদের বন্ধু নেটওয়ার্ক

আমরা সেশন-৪ যেমন বার্তা পাঠিয়েছিলাম সেই রকম আরেকটি বার্তা তৈরি করবো যেটি আমরা আমাদের নেটওয়ার্ক এর মাধ্যমে পাঠাবো নেটওয়ার্ক টি হবে আমরা যেভাবে সেশন ৩ এ দলগত ভাবে ভাগ হয়েছিলাম ঠিক সেই রকম করে নতুন দলে বিভক্ত হয়ে আমাদের বন্ধু নেটওয়ার্ক টি গঠন করবে। আমরা দলগত ভাবে একটি বার্তা লিখব যেটি আমরা পাঠাবো আরেক দলের কাছে। এবার আমার দলের সকল সদস্য বার্তাটি জানবে কিন্তু সেই বার্তা সেশন ৪ এ যেই বার্তা পাঠিয়েছি সেটার মত এনকোড করা থাকবে কিভাবে ডিকোড করতে হবে সেটি জানবে শুধু অন্য সহযোগী টিম।

এবার এসো নিচের কাজগুলো অনুসারে খেলাটি খেলবো:

১। আমাদেরকে নিজেদের দলের এবং হ্যাকার দলের বন্ধুদের বাড়ির অবস্থান জেনে আমরা একটি মানব নেটওয়ার্ক বানাবো।

২। প্রতি দুইজন বার্তা প্রদানকারী বন্ধুর মধ্যে একজন হ্যাকার বন্ধু পরবে।

৩। প্রথমে স্কুল থেকে সবচেয়ে দূরের বন্ধু বার্তাটি শুরু করবে, সে শুধু প্রথম অংশটি লিখবে তারপর হ্যাকার দলের বন্ধুর কাছে নিয়ে গিয়ে কোডেড বার্তাটি দিবে সেই বন্ধুর কাজ হবে গোপন বার্তাটিকে ডিকোড করা

৪। ডিকোড করার জন্য তার হাতে সময় থাকবে ১ ঘণ্টা এই সময় পরে তাকে বার্তাটি তার কাছের পরবর্তী বার্তা প্রেরণকারী বন্ধুর কাছে দিতে হবে ।

৫। এভাবে সকল বন্ধু পেরিয়ে বার্তাটি আবার বার্তা প্রেরনকারী দলের শেষ সদস্য এর কাছে আসবে। যদি বার্তাটি হ্যাকার দলের সদস্যরা উদ্ধার করতে না পারেন তাহলে বার্তা প্রেরণকারী দল জিতে যাবে আর বার্তা উদ্ধার করলে হ্যাকার দল জিতে যাবে। এভাবে আমরা পুরো খেলাটি শেষ করবো আর সেই সাথে গঠিত হবে আমাদের বন্ধু নেটওয়ার্ক।

এবার এসো, আমরা আমাদের স্কুল ও বন্ধুদের বাসার অবস্থান নিচের ম্যাপে চিহ্নিত করি এবং আমাদের নেটওয়ার্ক বানাই।

বন্ধুরা আমরা যে নেটওয়ার্কটি বানালাম, এটি হবে আমাদের তারবিহীন বন্ধু নেটওয়ার্ক। এই নেটওয়ার্কে আমারা নানা প্রয়োজনীয় তথ্য আদান-প্রদান করব এবং নেটওয়ার্কের গোপনীয়তা রক্ষা করব। এই খেলা যদি আমাদের মোবাইল ফোন এবং ইন্টারনেট সংযোগ থাকে, সেক্ষেত্রেও বিনা তারে যোগাযোগ করতে পারব আমাদের ক্লাস সিক্সে তৈরি বন্ধু কমিউনিটি নেটওয়ার্কের মতো। সেখানে আমরা শুধু হেঁটে এক বন্ধু থেকে আরেক বন্ধুর কাছে যাওয়ার বদলে বার্তাটি পাঠাব।

আগামী সেশনের প্রস্তুতি বন্ধু নেটওয়ার্ককে আরও শক্তিশালী এবং গোপনীয় করা যায়, কীভাবে তোমার কৌশল গুলো লিখে আনবে। আর আমরা বন্ধু নেটওয়ার্ক থেকে কী কী সুবিধা পেতে পারি লিখব।

বন্ধু নেটওয়ার্ককে আরও শক্তিশালী করার কৌশল

শিখন অভিজ্ঞতা ৭ — গ্রাহক সেবায় ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার

নাগরিকের সেবা নিশ্চিত করতে সরকারি বিভিন্ন সংস্থার কাজগুলো আর সহজে কী করে পাওয়া যায় তার জন্য এখন ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করা হচ্ছে। বিভিন্ন ওয়েবসাইট বা মোবাইল অ্যাপস ব্যবহার করে শহর থেকে গ্রাম পর্যায়ে সাধারণ নাগরিকেরাই এখন নাগরিক সেবা নিচ্ছেন। তা ছাড়া নিজেদের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রও আমরা ডিজটাল মাধ্যম ব্যবহার করে হাতের নাগালে পাচ্ছি। আগামী কয়েকটা সেশনে প্রয়োজনীয় কাজগুলো কত সহজে ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে সম্পন্ন করা যায়, আমরা তার কিছু অভিজ্ঞতা নেব।

সেশন ১ নাগরিক সেবা ও ই কমার্সের ধারণা তালিকা প্রস্তুত

প্রিয় শিক্ষার্থী, এই সেশনে স্বাগত। আগের শ্রেণিতে আমরা জরুরি সেবা প্রাপ্তির জন্য ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করেছিলাম, ঠিক একই ভাবে এই শ্রেণিতেও নাগরিক সেবা ও ই-কমার্সের জন্য ডিজিটাল মাধ্যমের কি ব্যবহার হতে পারে তার জন্য কিছু কাজ করব। এসো, নিচের উদাহরণটি আমরা সবাই নীরবে পাঠ করি।

জয়িতার বাবাকে প্রতি মাসের বিদ্যুৎ বিল ব্যাংকে গিয়ে পরিশোধ করতে হয়। কখনো কখনো লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে বিল দিতে গিয়ে অফিসেরও দেরি হয়ে যায়। আর বাড়ি থেকে ব্যাংকে যাওয়া আসাতেও বেশ কিছু টাকা যাতায়াত ভাড়ায় খরচ হয়ে যায়। প্রায়ই সে তার বাবাকে বলতে শোনে 'আজও অফিসে দেরি হয়ে গেছে!' তাই সে এই মাসের বিলের জন্য আগেই তার বাবার মোবাইলে একটা মোবাইল ব্যাংকিংয়ের অ্যাপ ইনস্টল ও অ্যাকাউন্ট খুলে তাতে টাকা রিচার্জ করে নিয়েছে। বিল আসামাত্র জয়িতা বাবাকে সঙ্গে নিয়ে ওই সব তথ্য পূরণ করে কয়েক মিনিটে বিল পরিশোধ করে দেয়। অল্প কিছু টাকা

সার্ভিস চার্জের বিনিময়ে এত সহজে সময় আর পরিশ্রম ছাড়াই বিল পরিশোধ করায় জয়িতার বাবাও খুব আনন্দিত। তিনি নিজেই পরের মাস থেকে এভাবেই বিল পরিশোধ করবেন বলে জানালেন।

উপরের কেস স্টাডির ভিত্তিতে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর জানার চেষ্টা করি।

- এখানে মূলত কোন মাধ্যম ব্যবহার করা হয়েছে?
- জয়িতার বাবা যে সেবাটা গ্রহণ করলেন , সেটাকে এক কথায় কী বলা যায়?
- মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে আর্থিক বিনিময়ের প্রক্রিয়াটাকে কী বলে?

- এমন আর কী কী সেবা রয়েছে যেগুলো আমরা ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে পাই?

- কেনাকাটা বা আর্থিক লেনদেনের জন্য আমাদের পরিচিতদের মধ্যে কেউ কি ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করেছি?

উপরের আলোচনা থেকে আমরা নাগরিক সেবা ও ই-কমার্সের ধারণা জানতে পারলাম। এবার নিচের ছকে কয়েকটি নাগরিক সেবা ও ই-কমার্সের নাম লিখে ফেলি।

নাগরিক সেবা	ই-কমার্স

জরুরি সেবা পাওয়ার ডিজিটাল মাধ্যমসমূহ

নাগরিক সেবা বা ই-কমার্স মূলত সেবা যিনি দেবেন (সেবা দাতা) ও যিনি নেবেন (সেবা গ্রহীতা) উভয়কেই ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে সম্পন্ন করতে হয়। ওয়েবসাইট বা মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপন হয়। এখনকার সময়ে যেকোনো সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান গ্রাহকের সুবিধার্থে ডিজিটাল মাধ্যমকে কাজে লাগিয়ে সেবা সহজ করে নিচ্ছে। এমনকি খুব সাধারণ মোবাইল ফোনে মেসেজ করেও আজকাল সেবা পাওয়া যাচ্ছে। আমাদের বাবা-মায়ের মোবাইল ফোনে যে সামাজিকযোগাযোগ মাধ্যম রয়েছে, সেখানেও দেখা যায় প্রাতিষ্ঠানিক বা ব্যক্তিগত পর্যায়ে বিভিন্ন সেবা দেওয়ার পেজ বা গ্রুপ থাকে। সেখান থেকেও খুব সহজে যোগাযোগ করে সেবা বা পণ্য পাওয়া যায়। তাহলে এসো নিচের ঘরগুলোতে নাগরিক সেবা ও ই-কমার্সের মাধ্যমগুলোর নাম লিখে ফেলি।

তবে কোনো প্রতিষ্ঠান সেবা নেওয়ার জন্য আর্থিক লেনদেন অবশ্যই আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে হয়ে থাকে। সে ক্ষেত্রে আমাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বা মোবাইল ব্যাংকিং অ্যাপ ব্যবহার করে আর্থিক লেনদেন সম্পন্ন করতে হয়। কেসস্টাডিতে আমরা লক্ষ্য করেছি, নিশ্চয়ই যে জয়িতা বিল পরিশোধের আগে বাবার মোবাইলে ব্যাংকিংয়ের একটি অ্যাপ ইনস্টল ও অ্যাকাউন্ট খুলেছিল।

সেশন ২ নাগরিক সেবা ও ই কমার্সের সুবিধা

আগের সেশনে আমরা নাগরিক সেবা ও ই-কমার্সের ধারণা পেয়েছি। এখন সেই সেবাগুলোর সুবিধাগুলো আমরা চিহ্নিত করব। আমাদের মাঝেও এমন অনেকেই আছি যারা আগের সেশনের উদাহরণটিতে জয়িতার মতো কোনো নাগরিক সেবা বা ই-কমার্সের অভিজ্ঞতা রয়েছে। যেমন উপবৃত্তির টাকা বা আমাদের পরিবারের বয়স্ক ব্যক্তির ভাতা পেয়েছি।

ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে নাগরিক বা ই-কমার্স সেবা নেওয়া ও দেওয়ার সময়, যাতায়াতের ও খরচ কমিয়ে দেয়। অল্প কিছু সার্ভিস চার্জের বিনিময়ে আমরা এই সেবাগুলো পেয়ে থাকি। এই সুবিধাগুলোর জন্য ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে সেবা গ্রহণ দিন দিন বেড়েই চলেছে। নিচের ছকে আমরা সুবিধাগুলো লিপিবদ্ধ করি...

ক্রম	নাগরিক সেবা ও ই-কমর্সের সুবিধা
১	খরচ কমে যায়।
২.	খুব কম সময়ে সেবা পাওয়া যায়
৩.	সেবা দাতার সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়।
৪.	
৫.	
৬.	
৭.	
৮.	

এবার নিচের ছবিটি ভালো করে লক্ষ্য করি এবং দলগতভাবে আমরা প্রদত্ত ছকে লিখি যে শিক্ষার্থী হিসেবে কী কী সেবা কোনো প্রয়োজনে এখান থেকে পেতে পারি?

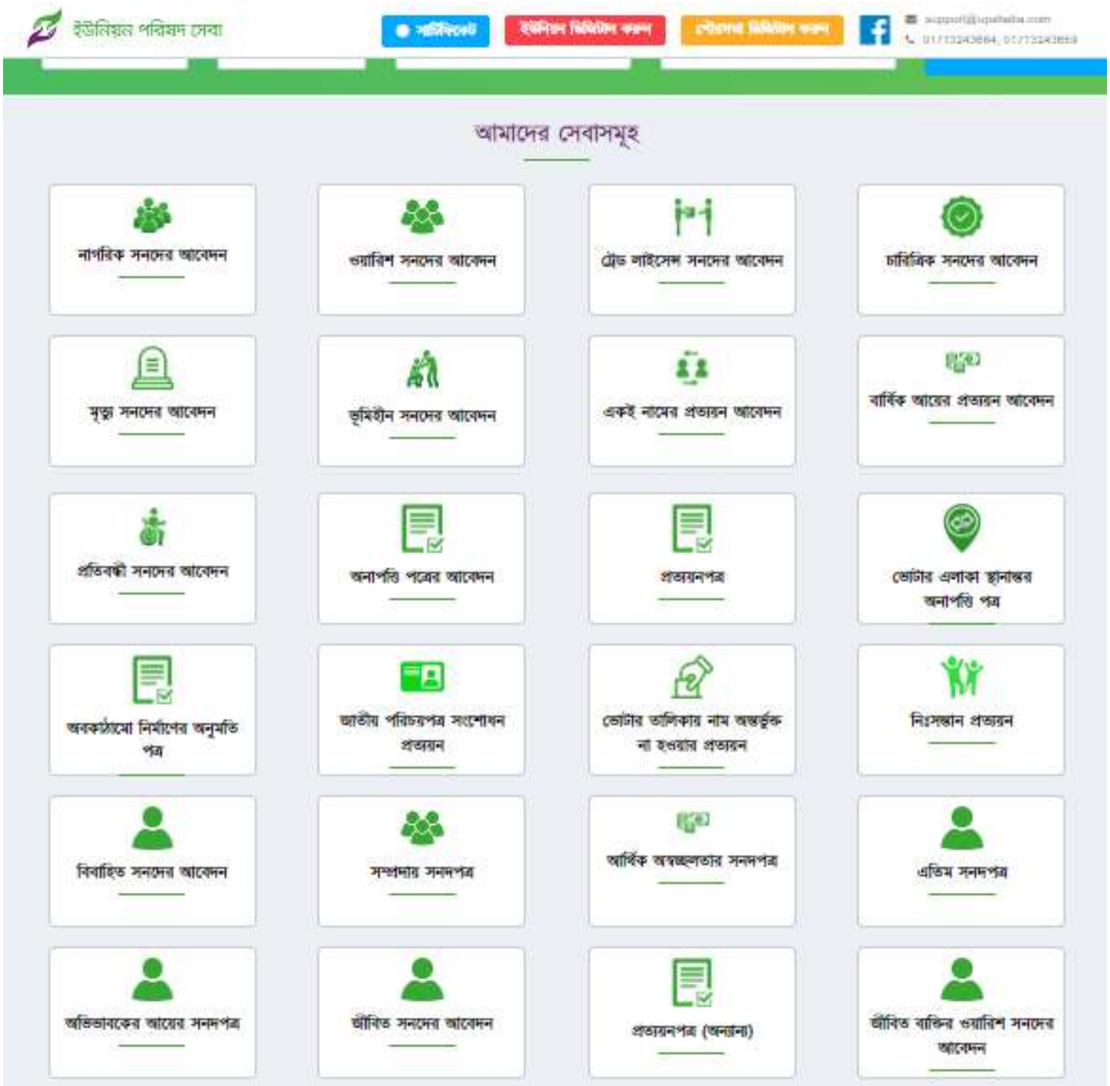

ক্রমিক	সেবার নাম	কোনো কাজের জন্য?
১.	প্রত্যয়ন পত্র	বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আবেদনের জন্য
২.	অভিভাবকের আয়ের সনদ	আর্থিক সহায়তা বা বৃত্তি পাওয়ার জন্য
৩.		
৪.		
৫.		

সেশন ৩ নাগরিক সেবা প্রাপ্তির ধাপসমূহ

আগের সেশনে একটি ওয়েবসাইটে কী কী নাগরিক সেবা আমরা কেন নেব, তার তালিকা তৈরি করতে পেরেছি। আজকে আমরা এমন একটি সেবা পাওয়ার জন্য আমাদের কী কী ধাপ অনুসরণ করতে হয় তা চিহ্নিত করব এবং সে অনুযায়ী একটি প্রবাহচিত্র প্রণয়ন করব।

আমি যে সেবাটা নিতে চাই সেটির জন্য আমাকে ডিজিটাল মাধ্যমে খুঁজতে হবে কোনো ওয়েবসাইট বা অ্যাপের সহায়তায় আমি সেই সেবাটি পেতে পারি। সরকারি- বেসরকারি সকল সেবাদাতার নির্দিষ্ট ওয়েবসাইট রয়েছে। আবার সরকারি সকল অফিসের ওয়েবসাইটে ‘সিটিজেন চার্টার’ বলে একটি বিভাগ থাকে যেটিতে বলা থাকে কীভাবে একজন সাধারণ নাগরিক সেবা পেতে পারেন। কী কী ধাপ বা কার সঙ্গে যোগাযোগ করলে সঠিক উপায়ে সেবাটি কোনো রকম বিড়ম্বনা ছাড়াই পাওয়া যাবে তার নির্দেশনা

দেওয়া থাকে। তাছাড়া বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট বা মোবাইল অ্যাপ ব্যবহার করে কী করে কোনো সেবা পাওয়া যাবে তারও নির্দেশনা সেখানে দেওয়া থাকে। ইদানীং অনেক প্রতিষ্ঠান তাদের সেবা পাওয়ার ধাপগুলো নিয়ে ভিডিও নির্দেশনা বা বিজ্ঞাপনও তৈরি করে।

আমাদের প্রতিষ্ঠানের জন্য যদি এমন একটি ওয়েবসাইট তৈরি করি, যেখানে এমন করেই সেবা প্রদানের প্রতিশ্রুতিগুলো উল্লেখ করতে হয়, তাহলে কী কী বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা যায় সেটা নিয়ে নিচের ছকটি পূরণ করি...

ক্রমিক নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	সেবামূল্য ও পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি
১	শিক্ষার্থী ভর্তি পরিচালনা	বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ভর্তির নোটিশ প্রদান	নির্ধারিত ফি মাধ্যমে ভর্তি ফরম ক্রয়	ডিসেম্বর	প্রধান শিক্ষক, সহকারী প্রধান শিক্ষক ও ভর্তি কমিটি
২	লাইব্রেরি ব্যবহার				
৩	বিজ্ঞান গবেষণাগার ব্যবহার				
৪	প্রত্যয়নপত্র সংগ্রহ				
৫	বার্ষিক পুরস্কার ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান				

পরের পাতার ছবিতে কী দেখতে পাচ্ছি? এটি দ্বারা কী সেবা পাওয়া যায়? নির্দিষ্ট সেবা পাওয়ার জন্য কী কী ধাপ বা করণীয় রয়েছে?

আগামী সেশনের প্রস্তুতি

নাগরিকদের সহজেই সেবা প্রদানের জন্য অনেক প্রতিষ্ঠানই এখন মোবাইল অ্যাপ তৈরি করেছে। ফলে সেবা এখন হাতের মুঠোয় চলে এসেছে। উপরের ছবিতে দেখা যাচ্ছে যে কত সহজেই কয়েকটি ধাপ অনুসরণ করেই একজন সাধারণ নাগরিক সেবা নিতে পারছেন। তাহলে আমার সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/ইউনিয়ন পরিষদের সেবাগুলো পাওয়ার জন্য যদি এমন একটা অ্যাপ তৈরি করতে হয়, তাহলে সেটির জন্য পরের পাতায় দেয়া ফ্লোচার্টটি আমরা বাড়ি থেকে পূরণ করে নিয়ে আসব।

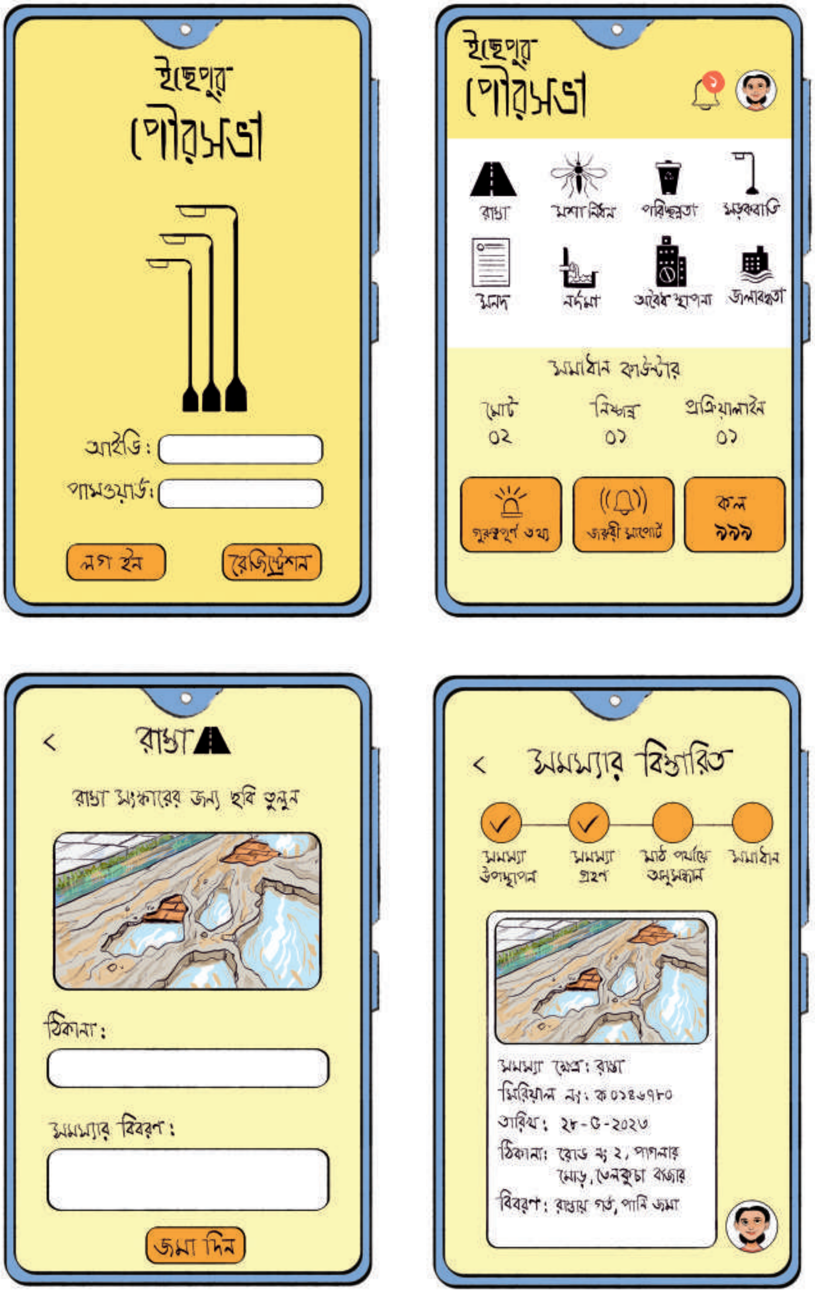

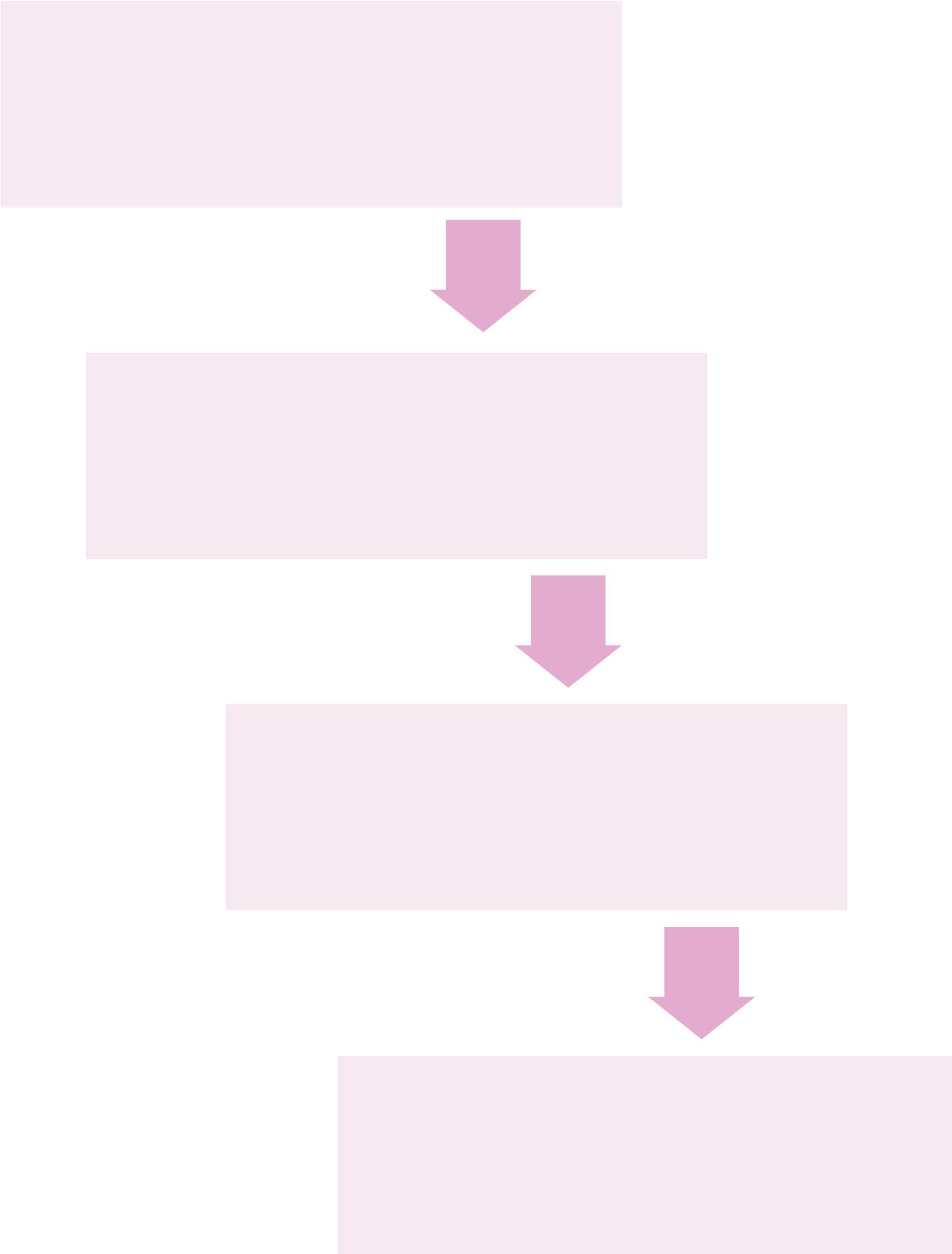

সেশন ৪ ই কমার্সের সেবাপ্রাপ্তির ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে ধাপ ও বিবেচ্য বিষয়াবলি

আজকের এই সেশনে আমরা জানব ই-কমার্সে কী করে একজন গ্রাহক হিসেবে পণ্য বা সেবা নিতে হয়। আরেকটু বড় হলে আমরাও ই-কমার্সের মাধ্যমে কিছু কিছু আয় করার চেষ্টা করব। ই-কমার্সের প্রচলনের ফলে অনেকে এখন খুব সহজেই অল্প পুঁজি নিয়েই ব্যবসা শুরু করেছে। আমাদের এখানে কেউ কি আছি যারা ই-কমার্সের কোনো অভিজ্ঞতা বিনিময় করতে পারি? আমরা একজন গ্রাহক এবং একজন সেবাদাতার অভিজ্ঞতা শুনব। আমাদের নিজেদের গ্রাহক বা সেবাদাতা হিসেবে না হলেও অন্য কারও কথা বলতে পারি। আমাদের অভিজ্ঞতার আলোকে আমরা বুঝতে পারলাম যে ই-কমার্সে গ্রাহক হিসেবে আমাদের পাঁচ থেকে ছয়টি ধাপে পণ্য বা সেবা ক্রয় করতে হয়।

নাগরিক সেবার মতোই ই-কমার্সের জন্যও কয়েকটি ধাপে সেবা নিতে হয়। তবে ই-কমার্স সেবাদাতাদের উদ্দেশ্য হলো পণ্য ক্রেতার বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া। তাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তৃতীয় কোনো পক্ষ পণ্য ও অর্থ লেনদেন করে থাকে। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে মো বাইল ব্যাংকিংও কাজে লাগাতে হয়। তাই ই-কমার্সের জন্য কয়েকটি ধাপ বেশি দরকার। তবে গ্রাহক হিসেবে আমাদের কোনো পণ্য অর্ডার করা, মূল্য পরিশোধ ও পণ্যটি গ্রহণ করা পর্যন্ত কাজ। মাঝে কিছু ধাপ পণ্য সরবরাহকারী বা ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান করে থাকে। যদি মূল্য অনলাইন বা মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে করা হয় সেক্ষেত্রে তা সফটওয়ারের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিশোধিত হয়। তবে অনলাইন বা মোবাইল ব্যাংকিংয়ে তথ্য প্রদানে আমাদের সতর্কতা ও গোপনীয়তা বজায় রাখতে হয়। একই পণ্য বা সেবা ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠানে দামে কমবেশি হয়ে থাকে। আবার পণ্যের মানের ব্যাপারেও যাচাই করে নিতে হয়। এটা বুঝতে হলে আগে কেউ এই পণ্য সেই প্রতিষ্ঠান বা ই-কমার্সের সেবাদাতার কাছ থেকে কিনে থাকলে রিভিউ অংশে সে বিষয়ে কমেন্ট দেখে বুঝে নিতে পারি তিনি কতটা সন্তুষ্ট হয়েছেন।

এতক্ষণ আমরা যে আলোচনা করলাম, তাতে বুঝতে পারলাম যে পণ্য বা সেবার জন্য আমাদের প্রযুক্তি ও ব্যক্তির দ্বারা কাজটি করতে হয়। এখন একটা মজার অভিনয়ের মাধ্যমে কাজটি শ্রেণিকক্ষে সম্পন্ন করি। এ জন্য আমাদের নিচের চরিত্রগুলোর অভিনয় করব...

১. গ্রাহক বা যিনি সেবা নেবেন (একজন)

২. মোবাইল বা কম্পিউটার (একজন)

৩. পণ্য বা সেবা (চার/পাঁচজন)

৪. টাকা বা ব্যাংকের কার্ড বা মোবাইল ব্যাংকিং অ্যাপ (একজন)

৫. বাহন (একজন)

৬. ডেলিভারিম্যান বা যিনি মালামাল পৌঁছে দেবেন (একজন)

এতক্ষণ যে অভিনয়টি দেখলাম, এই অভিজ্ঞতার আলোকে আমরা নিচের ছবির খালি ঘরগুলো পূরণ করে নিই...

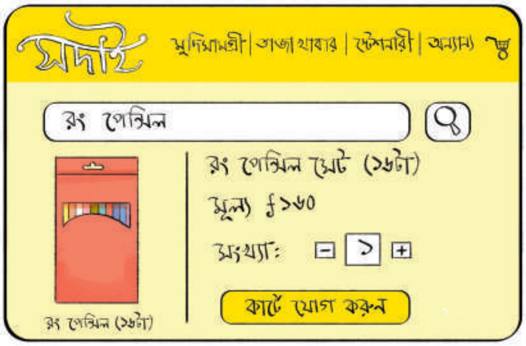

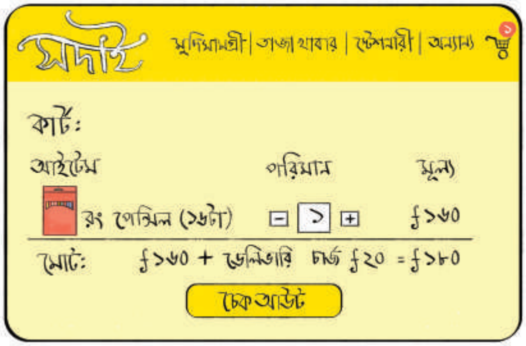

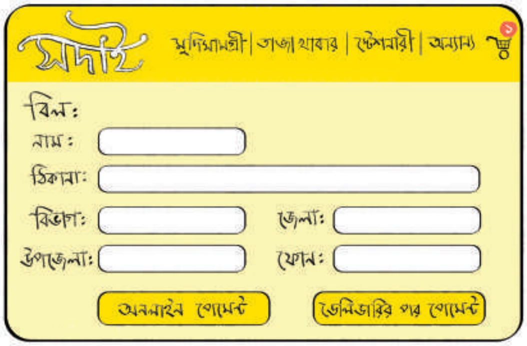

সেশন ৫ সেবাসমূহ প্রাপ্তির ধাপগুলো চিহ্নিত করে নির্দেশনা হ্যান্ডবুক বই তৈরি

আগের সেশনগুলোতে আমরা বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে নাগরিক সেবা ও ই-কমার্সের ধাপগুলো চিহ্নিত করতে পেরেছি। আজ আমরা এই ধাপগুলো নিয়ে কয়েকটি নির্দেশনা বই তৈরি করব যা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারব।

আমরা সম্পূর্ণ শ্রেণি ছয় (০৬)টি দলে ভাগ হব। প্রতিটি দল নিচে প্রদত্ত কাজগুলো নিয়ে কাজ করব।

ক. ১ম দল: সেবা প্রপ্তির সাধারণ নিয়মাবলি;

খ. ২য়, ৩য়, ৪র্থ দল: শ্রেণিতে আলোচনা সাপেক্ষে প্রাত্যহিক প্রয়োজনীয় তিনটি (একেক দল একটি করে) নাগরিক সেবাপ্রাপ্তির ধাপ;

গ. ৫ম ও ৬ষ্ঠ দল: শ্রেণিতে আলোচনা সাপেক্ষে প্রাত্যহিক প্রয়োজনীয় দুটি (একেক দল একটি করে) ই-কমার্স সেবাপ্রাপ্তির ধাপ;

আমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, ষষ্ঠ শ্রেণিতে বিদ্যালয় পত্রিকা তৈরি করেছিলাম। নির্দেশনা বইও অনেকটা সে রকম হবে। হ্যান্ডবুকটি যেন আকর্ষণীয় হয় সেজন্য প্রতিটি দল প্রতিটি বিষয়ের জন্য তথ্যচিত্র (ইনফোগ্রাফ) তৈরি করব। এই অভিজ্ঞতা বা অধ্যায়ের শেষে খালি যে দুটি পৃষ্ঠা দেওয়া হয়েছে; আমরা সেগুলোতে কাজ করব। কাজ শেষে সেই পৃষ্ঠাগুলো একসঙ্গে করে একটি হ্যান্ডবুক তৈরি করব এবং তা আমাদের লাইব্রেরিতে সংরক্ষণ করব।

সেশন ৬ নাগরিক সেবা গ্রহণ

আমরা শ্রেণিতে আজ কীভাবে জন্ম তথ্য যাচাই করা যায় তা জানব। আমরা এর আগে শ্রেণিতে জরুরি সেবায় দেখেছিলাম কী করে আমাদের জন্ম নিবন্ধন করতে হয়। এই অভিজ্ঞতায়ও জেনেছি। স্থানীয় সরকারের ওয়েবসাইট বা অ্যাপ থেকেও আমাদের জন্ম নিবন্ধন করা যায়। আমাদের সকলের জন্ম নিবন্ধন রয়েছে, কিন্তু সেটি সঠিক কি না, তা যাচাই করে নেওয়া জরুরি। তাই এই সেশনে আমরা দেখব কী করে জন্ম তথ্য যাচাই করা যায়। এই নাগরিক সেবাটি খুব সহজেই জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন রেজিস্টারের ওয়েবসাইট বা কিছু কিছু অ্যাপ (বেসরকারিভাবে তৈরি করা) থেকে করা সম্ভব। এই কাজটি করতে আমরা শিক্ষকের সহায়তা নেব।

শিক্ষকের মতো আমাদেরও জন্ম নিবন্ধন নম্বর গোপন রেখে যাচাইয়ের কাজটি করতে হবে। এটি হলো তথ্যের গোপনীয়তা। আগের শ্রেণিতে আমরা এটি জেনেছিলাম। আর এই কাজটি আমাদের নিজেদের করার জন্যই আজকের ক্লাসে আমরা নিয়মটি জেনে নিলাম। নিচের ছবির মতো করে আমরাও নিজেদের জন্ম নিবন্ধন নম্বরটি যাচাই করে নেব।

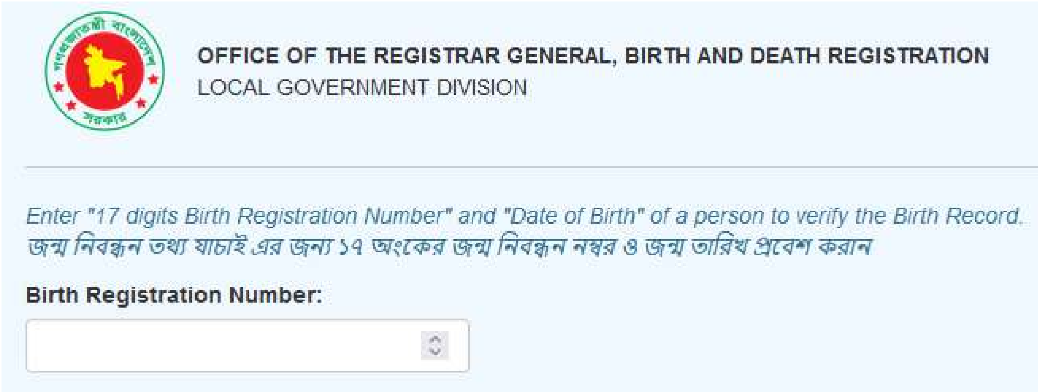

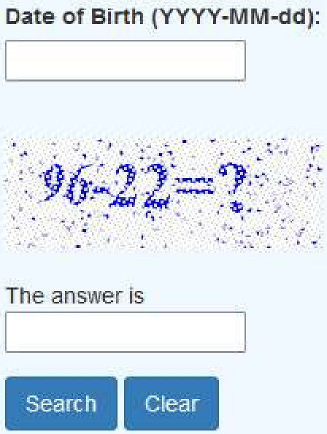

সবার নিচে মজার একটি ব্যাপার খেয়াল করি। ওয়েবসাইটটি আমাকে বলছে ৯৬ থেকে ২২ বিয়োগ করে তার ফলটি লিখতে। কেন? কারণ, তারা চাচ্ছে না মানুষ স্বয়ংক্রিয় রোবট সফটওয়্যার ব্যবহার করে অসংখ্যবার এই ওয়েবসাইটটি ব্যবহার করতে গিয়ে সার্ভারের উপর চাপ সৃষ্টি করুক। অনেক ওয়েবসাইটেই এ রকম কিছু ছোট ধাঁধা দেওয়া থাকে যেটি মানুষের জন্য সহজ ও রোবটের জন্য কঠিন। এই কাজটি দ্বারা আমরা প্রমাণ করি যে আমরা এই ওয়েবসাইটের প্রকৃত ব্যবহারকারী।

ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে আমাদের জন্ম নিবন্ধন নম্বর, জন্ম তারিখ আর সংখ্যা সমাধান উত্তরটি লিখে সার্চ দিলে নিচের ছবির মতো তথ্য প্রদর্শিত হবে। এর মাধ্যমে যাচাই করে নিতে পারি জন্ম নেবন্ধনে আমাদের সকল তথ্য সঠিক আছে কি না। নিচের ছবিতে অনেকগুলো ঘর খালি রয়েছে যেখানে আমাদের তথ্যগুলো দিয়ে পূরণ করব।

আমার পরিবার বা নিকটজনের প্রয়োজনে আর কী কী নাগরিক সেবা জিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে গ্রহণ করতে পারি, তার একটি তালিকা প্রস্তুত করি এবং নিচের ঘরে লিখি।

১. টিকা সনদ	৬.
২. বয়স্ক ভাতার আবেদন ফরম	৭.
৩.	৮.
৪.	৯.
৫.	১০.

শ্রেণির বাইরের কাজ

আমরা বিগত সেশনগুলোতে অনেক কাজের মাধ্যমে ডিজিটাল পদ্ধতি ব্যবহার করে নাগরিক সেবা ও ই-কমার্সের গ্রহণের উপায় জেনেছি। আমরা নিজেদের প্রয়োজন ছাড়াও আমার পরিবার বা নিকটজনের জন্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে নাগরিক সেবার যে তালিকা গত ক্লাসে তৈরি করলাম, তার থেকে যেকোনো একটির জন্য আমরা ধাপ অনুসরণ করে সেবা গ্রহণ করব এবং আগামী ক্লাসে নিচের ঘরে একটি প্রতিবেদন লিখে আনব।

প্রতিবেদন

নাগরিক সেবা গ্রহণে ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার

সেবার নাম:

যার জন্য সেবা নেওয়া হয়েছে:

কোনো মাধ্যম ব্যবহার করা হয়েছে:

অনুসরণ করা ধাপসমূহ:

সেবা প্রাপ্তির জন্য কতক্ষণ সময় লেগেছে:

প্রাপ্ত ফলাফল:

শিখন অভিজ্ঞতা ৮

যোগাযোগে নিয়ম মানি

সেশন ১

ষষ্ঠ শ্রেণিতে আমরা জেনেছি, যোগাযোগ হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া, যেখানে আমরা আমাদের চিন্তা, ধারণা, অনুভূতি, অভিজ্ঞতা এবং মতামতো একে অন্যের সঙ্গে আদান-প্রদান করি। আমরা যোগাযোগের কয়েকটি ধরন সম্পর্কে বোঝার চেষ্টা করেছিলাম, যেমন – মৌখিক যোগাযোগ, লিখিত যোগাযোগ, অমৌখিক বা সাংকেতিক যোগাযোগ। ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্ক এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী যোগাযোগ দুই ধরনের হয়ে থাকে, আনুষ্ঠানিক বা ফরমাল যোগাযোগ এবং লৌকিকতা বর্জিত বা ইনফরমাল যোগাযোগ।

একবার সজল একটি বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে তাদের থানা পর্যায়ের একটি স্কুলে গেল। সজলের বাবা সজলকে পৌঁছে দিয়েই তার অফিসে চলে গেলেন। সজল একা একা ঐ বিদ্যালয়ের ভেতরে ঢুকল। এখানকার কাউকেই সজল চেনে না। প্রতিযোগিতার একটি বড় পোস্টার দেখে সে বুঝতে পারল তাকে কোথায় যেতে হবে। ওখানে গিয়ে দেখতে পেল একজন আপু ডেস্কে বসে আছেন এবং সবার উপস্থিতি নিশ্চিত করছেন। সজল তার কাছে গিয়ে তার নাম বলল এবং জিজ্ঞেস করল তাকে এখন কী করতে হবে। আপু কথা বলা শুরু করতে না করতে সজলের বয়সী আরেকটি ছেলে এসেই ডেস্কের সামনে রাখা চেয়ারে বসে পড়ল এবং বলল, ‘কী করতে হবে’। সজল ভাবল, এই ছেলেটি নিশ্চয়ই এখানকার সবাইকে চেনে, কিন্তু সজল তো কাউকে চেনে না, এটা ভেবেই সজলের একটু মন খারাপ হলো। কিন্তু ওই আপুটি সজলকে অবাক করে দিয়ে ঐ ছেলেকে বলল ‘আপনার নাম কি ? কেন এসেছেন? আপনাকে কে বসতে বলেছে?’। ছেলেটি সঙ্গে সঙ্গে চেয়ার ছেড়ে উঠে বলল, ‘আমি বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে এসেছি।’

গল্পের ছেলেটি বুঝতে পারেনি যে কোনো অপরিচিত কারও সঙ্গে কথা বলতে হলে, প্রথমে নিজের পরিচয় দিতে হয়, তারপর কেন কথা বলতে চায় সে উদ্দেশ্য বা কারণ জানাতে হয়। তারপর সে বসতে বললে বসতে হয় বা বসার অনুমতি চাইতে হয়। আমাদের কথা বলা, কথার মধ্যে শব্দের ব্যবহার এবং আমাদের শারীরিক ভাষা বা বডি ল্যাঙ্গুয়েজ এই সব বিষয় যোগাযোগের ক্ষেত্রে বেশ গুরুত্বপূর্ণ। আমরা কমবেশি এগুলো জানি।

তোমার মনে কী প্রশ্ন এসেছে , ডিজিটাল প্রযুক্তি বইতে আমরা এগুলো নিয়ে কেন কথা বলছি?

যোগাযোগের এই নিয়মকানুনগুলো নিয়ে এখানে কথা বলার কারণ হচ্ছে, সাধারণ জীবনে আমরা এই বিষয়গুলো জানলেও ডিজিটাল যোগাযোগের ক্ষেত্রে আমরা এই একই নিয়মগুলো কীভাবে কাজ করে তা একটু আলাদা করে বুঝে নিতে চাই।

তার আগে চলো আমরা একটি ভূমিকাভিনয় বা রোলপ্লে খেলি।

শ্রেণিকক্ষের দুজন দুজন করে মোট ছয়জন আমরা ভূমিকাভিনয় করব, বাকিরা তাদের অভিনয় দেখে কোনো অভিনয়টি পরিস্থিতি এবং সম্পর্ক অনুযায়ী সঠিক হচ্ছে না সেটি বুঝে মতামতো দেব।

১. ১ম জোড়া - একজন প্রধান শিক্ষক ও একজন শিক্ষার্থীর ভূমিকায় অভিনয় করব (শিক্ষার্থী শিক্ষকের কাছে ক্লাসের পরে পড়া বুঝতে গিয়েছে)

২. ২য় জোড়া - একজন পুলিশ অফিসার এবং একজন শিক্ষার্থীর ভূমিকায় অভিনয় করব (শিক্ষার্থী থানায় অভিযোগ জানাতে গিয়েছে)

৩. ৩য় জোড়া - একজন বন্ধু অন্য একজন বন্ধুর কাছে গতকাল রাতে টেলিভিশনে প্রচার হওয়া ফুটবল খেলার ফলাফল ও খেলা কেমন ছিল তা জানতে চাচ্ছে।

আনুষ্ঠানিক যোগাযোগে কিছু বিধিবদ্ধ শিষ্টাচার বজায় রেখে উপযুক্ত আচরণের মাধ্যমে একে অন্যের সঙ্গে যোগাযোগ করে অন্যদিকে অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে তেমন কোনো নিয়মকানুনের বাধ্যবাধকতা থাকে না। ব্যক্তির সম্পর্ক এবং পরিস্থিতির কারণে এই ভিন্নতা তৈরি। যেমন ভাই-বোন, বাবা মা, কাছের আত্মীয়, বন্ধু এদের সঙ্গে আমরা সাধারণত অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগ করে থাকি। অন্যদিকে শিক্ষক, অপিরিচিত বা অল্প পরিচিত ব্যক্তি, বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি এদের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ হয়ে থাকে।

আমরা যে তিনটি ভূমিকাভিনয় করলাম এবং দেখলাম, তার মধ্যে কোনোটি কী ধরনের যোগাযোগ তা টিক দিই—

	আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ	অনানুষ্ঠানিক বা লৌকিকতা বর্জিত যোগাযোগ
শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর সঙ্গে যোগাযোগ		
পুলিশের সঙ্গে শিক্ষার্থীর যোগাযোগ		
দুই বন্ধুর মধ্যে যোগাযোগ		

আগামী সেশনের প্রস্তুতি

ভূমিকাভিনয় একে অন্যের সঙ্গে যোগাযোগের সময় কোনো ভুল হয়েছিল কি না, আর ভুল হলে সেটি কী ধরনের ভুল তা নিচের ছকে লিখি। আমাদের সুবিধার্থে একটি উদাহরণ নিচে দেওয়া হলো। আমরা কমপক্ষে আরও পাঁচটি ভুল নিচের ছকে লিখব। আমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেও খুঁজে বের করতে পারি।

১. শিক্ষকের সঙ্গে যোগাযোগের সময় প্রথমে কুশল বিনিময় করেনি
২.
৩.
৪.
৫.
৬.

সেশন ২ যোগাযোগের মাধ্যম বা চ্যানেল

আমরা যখন সামনা সামনি একে অন্যের সঙ্গে কথা বলি বা মৌখিক যোগাযোগ করি, তখন শব্দের সৃষ্টি হয় এবং আর এই শব্দ প্রবাহিত হয় বাতাসের মাধ্যমে। তাই এখানে বাতাস হচ্ছে একটি 'মাধ্যম'। যা ব্যবহার করে প্রাপক ও প্রেরক একে অন্যের সঙ্গে যোগাযোগ করে, তা হলো মাধ্যম। যেমন চিঠি, টেলিফোন ও ইন্টারনেট হলো মাধ্যম।

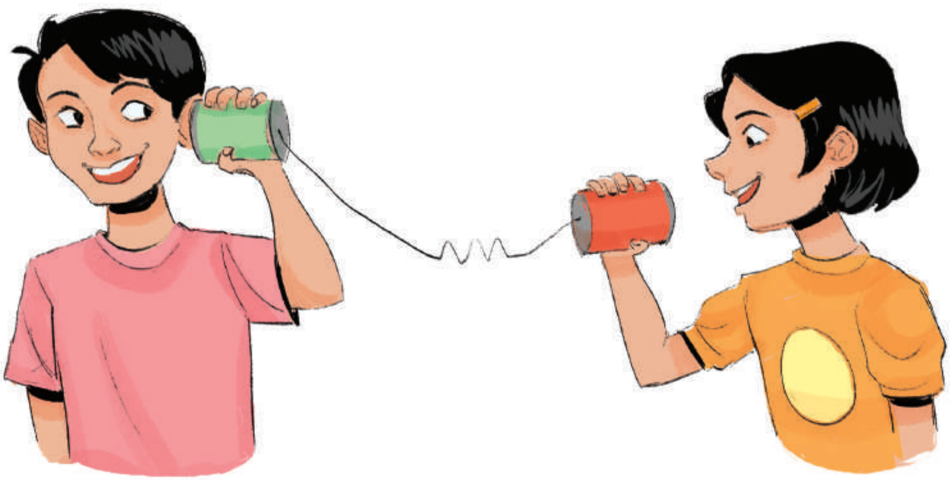

বিদ্যুৎ এবং ইন্টারনেট আবিষ্কারের ফলে আমাদের যোগাযোগের সুবিধার্থে অনেক অনেক যোগাযোগমাধ্যম তৈরি হয়েছে। টেলিভিশন, রেডিও, টেলিফোন এগুলোর কথা তো আমরা সবাই জানি, কিন্তু ইন্টারনেট সুবিধা নিয়ে আমরা নিয়মিত আরও অনেক মাধ্যম বা চ্যনেল ব্যবহার করি। যেমন —

১. ইমেইল

২. ওয়েবসাইট

৩. ভিডিও কল

৪. ভয়েস কল / রেকর্ড করা ভয়েস

৫. চ্যাট মেসেজ

৬. সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম

৭. ব্লগ

৮. ভ্লগ

৯. ভার্চুয়াল মিটিং/ক্লাস রুম

আনুষ্ঠানিক বা অফিসিয়াল যোগাযোগের ক্ষেত্রে যোগাযোগের মাধ্যমটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যেমন সরকার থেকে যখন কোনো নির্দেশনা আসে, তখন সাধারণত এটি পত্রিকায় বিজ্ঞাপন আকারে ছাপা হয় আবার ওয়েবসাইটে রাখা হয় যেন সকল মানুষ সেটি জানতে পারে। অনেক সময় ফোনে এসএমএস আসে। তা ছাড়া ব্যক্তি পর্যায়ে সকল সরকারি যোগাযোগ এখনও ডাকের মাধ্যমেই হয়। কারণ দেশের সবার কাছে তো ইন্টারনেট নেই !

কিন্তু আমরা যখন খুব ছোট পরিসরে যোগাযোগ করি, তখন যদি আমাদের ইন্টারনেট সুবিধা থাকে তাহলে কোনো মাধ্যম ব্যবহার করা সবচেয়ে সঠিক বা সমীচীন হবে ?

নিচের ঘটনাগুলো বিশ্লেষণ করে সঠিক মাধ্যম কোনোটি হতে পারে সেটিতে টিক √ দিব । একটি উদাহরণ দেওয়া হলো।

১. আমি যদি উপজেলা শিক্ষা অফিসে বৃত্তির আবেদনের সঠিক নিয়ম জানতে চাই।	ক. ইমেইল করব √ খ. ফোন দেব গ. মেসেঞ্জারে টেক্সট পাঠাব
২. শিক্ষকের কাছে আগামীদিনের পরীক্ষা বাতিল হয়েছে কি না, সে বিষয়ে নিশ্চিত হতে যোগাযোগ করব।	ক. ভিডিও কল দেব, খ. এসএমএস করব গ. ভ্লগ বানাব
৩. বন্ধুর কাছে আগামীকালের বাড়ির কাজ জানতে যোগাযোগ করব।	ক. অডিও কল দেব খ. সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লিখ গ. ইমেইল করব
৪. নিজের উপজেলায় পরিবেশ দিবস পালন উপলক্ষে আন্তঃ উপজেলা পরিবেশ বিজ্ঞান মেলা আয়োজন করার জন্য উপজেলা শিক্ষা অফিসারের নিকট আবেদন করব।	ক. চ্যাটে টেক্সট পাঠাব খ. অডিও কল দেব গ. ইমেইল করব

আগামী সেশনের প্রস্তুতি

আমরা এই অভিজ্ঞতার মাধ্যমে, সবাই মিলে আমাদের আশপাশের এমন একটি সমস্যা চিহ্নিত করব যেটির সমাধান একা করা প্রায় অসম্ভব। এই সমস্যা সমাধানের জন্য কোনো ব্যক্তি, সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের সহায়তার প্রয়োজন হবে। আমরা আজ বিদ্যালয় থেকে বাড়ি ফেরার পথে এমন একটি সমস্যা খুঁজে বের করব।

সমস্যাটি এ রকম হতে পারে— বিদ্যালয়ের পাশের রাস্তা মেরামত, বিদ্যালয়ের কাছের বাঁধ নির্মাণ, বিদ্যালয়ের পাশের রাস্তা পারাপারের ফুট ওভারব্রিজ নির্মাণ, বিদ্যালয়ের পাশে ডাস্টবিন তৈরি, বিদ্যালয়ে বিশুদ্ধ খাবার পানির জন্য টিউবওয়েল বসানো ইত্যাদি। এই উদাহরণগুলো বোঝার সুবিধার্থে দেওয়া হলো, তুমি তোমার বিদ্যালয়ের চারপাশ পর্যবেক্ষণ করে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা খুঁজে বের করবে।

সেশন–৩ যোগাযোগ ও ভাষার ব্যবহার

এক ছুটির দিনে বাবা-মা বাড়ির কাজ নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত! আমিও বাবা-মাকে সাহায্য করে ক্লান্ত হয়ে বসে বসে বই পড়ছিলাম। হঠাৎ বাবা এসে বললেন, ‘তন্ত চুলায় ভাত বসিয়েছি, তুমি রান্নাঘরের পাশে বসে গল্পের বই পড়ো, ভাতগুলো দেখে রেখ’। আমি পড়ছি, ভাত রান্না হচ্ছে, আমি পড়ছি ভাতের পাতিলের অনেক ফেনা উঠে পাতিলের ঢাকনা পড়ে গেল, কিছুক্ষন পর ভাত পোড়া গন্ধ পেলাম, আমি পড়ছি। একটু পর মা এসে তাড়াতাড়ি ভাতের পাতিল নামালো আর আমাকে খুব বকা দিলেন! আমি বুঝলাম না, মা এত রেগে গেলেন কেন? আমাকে ভাত দেখতে বলেছে, আমি তো দেখছিলাম! এক মিনিট পর পরই নিয়ম করে বই থকে চোখ তুলে ভাতের পাতিল দেখছিলাম!

এই ধরনের কৌতুক আমরা প্রায় শুনি তাই না? ‘ভাত দেখে রাখা’ মানে হচ্ছে ‘ভাত হয়ে গেলে নামিয়ে ফেলা’ এটি আমরা সবাই বুঝি। কিন্তু এমন অনেক শব্দ আছে হয়তো দুই দেশে বা দুই জেলায় দুই রকমের অর্থ বোঝায়। তাই যোগাযোগের ক্ষেত্রে আমরা যার সঙ্গে যোগাযোগ করছি, সে যেন আমার বার্তা বা মেসেজের অর্থ বুঝতে পারে তা আমাদের লক্ষ্য রাখতে হয়।

যোগাযোগের প্রক্রিয়ার ব্যক্তির নিজস্বতা: যোগাযোগ নিয়ে যারা গবেষণা করেন, তারা মনে করেন যোগাযোগের ক্ষেত্রে সামাজিক রীতিনীতি ও সাংস্কৃতিক উপাদান অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আমরা যার সঙ্গে যোগাযোগ করব তার সংস্কৃতি, তার কোনো কিছু বোঝার দৃষ্টিভঙ্গি, তার সামাজিক আচার-আচরণ আমাদের বুঝে তারপর আমাদের যোগাযোগ করতে হয়, তা না হলে আমার যোগাযোগটি সফল হবে না।

চিত্র: ক

প্রেরক/ sender   বার্তা/ Message   মাধ্যম /Channel   প্রাপক/ Receiver

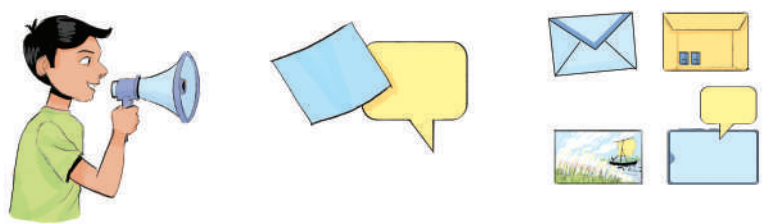

১. যোগাযোগের দক্ষতা
২. দৃষ্টিভঙ্গি
৩. জ্ঞান
৪. সামাজিক রীতিনীতি
৫. সংস্কৃতি

১. যোগাযোগের দক্ষতা
২. দৃষ্টিভঙ্গি
৩. জ্ঞান
৪. সামাজিক রীতিনীতি
৫. সংস্কৃতি

এখানে বোঝাতে চেয়েছে, একজন ব্যক্তি যখন অন্যের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চায়, তখন তাদের

উভয়পক্ষের যোগাযোগ দক্ষতা, চিন্তার ধরন, জ্ঞান, তাদের সমাজে প্রচলিত নিয়মকানুন এবং সংস্কৃতি যোগাযোগের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রাখে। যেমন একজন শিশু, যে কেবলমাত্র কয়েকটি শব্দ বলতে শিখেছে, তাকে যদি গিয়ে আমি বলি, 'আমি টিফিন ব্রেকের সময় স্কুল থেকে চলে আসব তারপর তোমাকে বেড়াতে নিয়ে যাবো।' সে হয়তো টিফিন ব্রেক শব্দটির সঙ্গে পরিচিত নয় তাই সে বুঝবেই না আমি কী বলতে চাচ্ছি। আবার ধরি, একজন নতুন রিকশাচালক যে ট্রাফিক নিয়মকানুন কিছুই জানেন না, তাকে বললাম, 'আপনি জেব্রাক্রসিং এর সামনে রিকসা থামাবেন।' তিনি কি বুঝতে পারবেন?

তাই যার বা যাদের সঙ্গে যোগাযোগ করব তাদেরকে বুঝে নেওয়াটা জরুরি, তা না হলে সফলভাবে যোগাযোগ করা সম্ভব হবে না।

আনুষ্ঠানিক বা ফরমাল যোগাযোগে ভাষার ব্যবহার: আমরা আমার বন্ধুর সঙ্গে যেভাবে কথা বলি, আমার শিক্ষকের সঙ্গে সেভাবে কথা বলি না এটি আমরা এর আগে ভূমিকাভিনয়ের মাধ্যমে চিহ্নিত করতে পেরেছি। কিন্তু আমরা যদি কারও সঙ্গে লিখিতভাবে আনুষ্ঠানিক বা অফিসিয়াল প্রথায় যোগাযোগ করি, তাহলে বাক্যের গঠন কিছুটা আলাদা হবে—

অনানুষ্ঠানিক/ বন্ধু বা সমবয়সীদের সঙ্গে	বয়োজ্যেষ্ঠ বা অল্প পরিচিত মানুষের সঙ্গে	আনুষ্ঠানিক যোগাযোগে লিখিত আকারে
কী অবস্থা?	আপনি ভালো আছেন?	আশা করি আপনি সুস্থ আছেন।
এ কাজ আমি এখন করতে পারব না।	আমার পক্ষে এত অল্প সময়ে কাজটি করা সম্ভব হবে না	যদি কিছু মনে না করেন, আমি কি কাজটি করার জন্য আর দুই দিন সময় পেতে পারি?
গতকাল তুমি ফোন ধরোনি কেন?	আমি গতকাল আপনাকে ফোন দিয়েছিলাম, আমার একটু জরুরি কথা ছিল। আমি কি কথাটি এখন বলতে পারি?	গতকাল আমি একটি জরুরি বিষয় জানাতে ফোন দিয়েছিলাম। আপনি সম্ভবত ব্যস্ত ছিলেন। আমি আজ কখন ফোন দিলে আপনার সুবিধা হবে?
চল বন্ধু ছবি তুলি	আমি কি আপনার সঙ্গে একটি ছবি তুলতে পারি?	আগামীকাল অনুষ্ঠান শেষে আমরা সবাই আপনার সঙ্গে ছবি তোলার ইচ্ছা পোষণ করছি। আশা করি আপনি আমাদের সঙ্গে ছবি তোলার জন্য কিছুটা সময় বরাদ্দ রাখবেন।

এবার আমরা একটি খেলা খেলব-

তোমরা কি কখনো গানের কলি খেলেছ? একদল একটি গান গায় সে গানের শেষের অক্ষর দিয়ে অন্যদলকে আরেকটি গান গাইতে হয়। আজকের খেলাটি অনেকটা সে রকম। শ্রেণিকক্ষের সবাই দুই দলে ভাগ হয়ে একদল একটি অনানুষ্ঠানিক ধারার বাক্য বলবে অন্য দল সে বাক্যটি আনুষ্ঠানিক ভাবে বললে কেমন হতে পারে তা বলবে, বলার পর তার আবার অন্যদলকে একটি অনানুষ্ঠানিক ধারার বাক্য দেবে। তারা আবার ঐ বাক্যটি আনুষ্ঠানিক ধারার হলে কেমন হবে তা বলবে। একটি বাক্য রূপান্তর করার জন্য প্রতিটি দল এক মিনিট করে সময় পাবে।

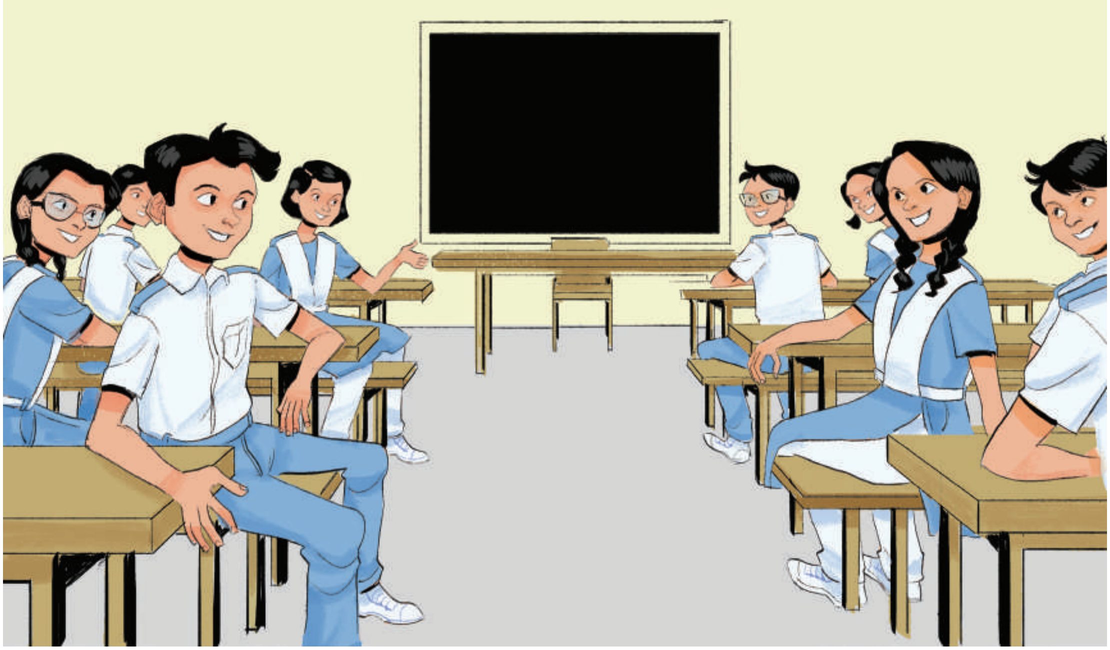

আগামী সেশনের প্রস্তুতি আমার চিহ্নিত সমস্যা সমাধানের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি, সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান কে হতে পারে তা ভেবে বের করব।

সেশন-৪ আনুষ্ঠানিক যোগাযোগের প্রস্তুতি

আনুষ্ঠানিক যোগাযোগের প্রচলিত মাধ্যম হচ্ছে দরখাস্ত অথবা চিঠি। আমরা আমাদের বিদ্যালয়ের শিক্ষক বা প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে কোনো বিষয়ে আবেদন জানানোর জন্য সাধারণত দরখাস্ত লিখে থাকি। তবে এখন যেহেতু আমাদের ঘরে ঘরে ইন্টারনেট সেবা পৌঁছে যাচ্ছে, তাই আমরা একই যোগাযোগটি করতে পারি ইমেইলের মাধ্যমে। আজ ইমেইল লেখার জন্য যে খুটিনাটি বিষয়গুলো জানা প্রয়োজন, তা আমরা একটু দেখে নেব।

আমাদের কি মনে আছে আমরা আমাদের আশপাশের একটি সমস্যা সমাধানের জন্য কোনো ব্যক্তি, সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের কাছে আবেদন জানাবো? হ্যাঁ, এ জন্যই আমাদের ইমেইল লেখার প্রস্তুতি আজকে সম্পন্ন করব।

ইমেইলের সুবিধা হচ্ছে —

১. আমরা খুব দ্রুত সময়ে যোগাযোগ করতে পারি।

২। একই সঙ্গে একের অধিক ব্যক্তিকে একই ইমেইল পাঠাতে পারি। (কয়েকটি সুবিধা নিজে খুঁজে বের করে লিখবো)

৩। অনেক কম খরচে যোগাযোগ করতে পারি,

৪। আমার ইমেইলটি যে ব্যক্তিকে পাঠাচ্ছি, সে ব্যক্তি ছাড়া আমি না চাইলে অন্য ব্যক্তি আমার ইমেইলটি দেখে ফেলার ঝুঁকি কম। যেটি চিঠির ক্ষেত্রে ঝুঁকিটা বেশি থাকত।

৫। ইমেইলে আমি বড় কোনো ফাইল বা ছবি যুক্ত করতে পারি।

৬। আমি চাইলে একই সঙ্গে একাধিক ব্যক্তিকে ইমেইল পাঠাতে পারি; কিন্তু এটিও ঠিক করে দিতে পারি, আমার প্রাপকরা জানবে না আমি কাকে কাকে এই একই ইমেল পাঠাচ্ছি।

আমরা ষষ্ঠ শ্রেণিতে জেনেছি –

- 'To' ঘরে আমার প্রাপকের ইমেইল ঠিকানা লিখতে হবে।
- 'Subject' ঘরে আমি যে বিষয়ে ইমেইল লিখতে চাই সেই বিষয় লিখব। অনেকটা দরখাস্ত বা আবেদনপত্রে যেভাবে বিষয় লিখি
- 'Body' ঘরে আমার পুরো ইমেইলটি লিখব।
- 'Attachement' এ ক্লিক করে আমরা ইমেইলের সঙ্গে কোনো ফাইল বা ছবি পাঠাতে হলে তা যুক্ত করব।

আমরা ইমেইলের আরও কিছু ফিচার জানব।
বিশ্বে অনেকগুলো ইন্টারনেট সেবাদানকারি প্রতিষ্ঠানের ইমেইল সেবা রয়েছে।

যেমন জিমেইল, ইয়াহু, আউটলুক ইত্যাদি। আবার আমরা যখন নিজেদের জন্য নিজেস্ব ওয়েবসাইট তৈরি করব তখন ওই ওয়েবসাইটেও আলাদা করে ইমেইল সেবা যোগ করতে পারব।

সব ইমেইলেই কিছু সাধারণ বা প্রচলিত ফিচার থাকে যেগুলো বিভিন্ন ইমেইলের ক্ষেত্রে প্রায় একই রকম। এ রকম কিছু ফিচার একটু দেখে নিই।

1. 'New/Compose' এ ক্লিক করে আমার ইমেইল লেখা শুরু করতে পারি। অর্থাৎ এখানে ক্লিক করলে ইমেইল লেখার জন্য একটি বক্স আসবে। এটিকে এই ধরনের কলমের মতো সাংকেতিক চিহ্ন দিয়েও বোঝানো হয়।
2. 'Inbox' এ আমার ইমেইলে অন্য কেউ যদি ইমেইল পাঠায়, সেগুলো জমা হয়ে থাকে।
3. 'Sent' বক্সে আমি যা যা ইমেইল পাঠাব সেগুলো জমা থাকবে।
4. 'Junk/Spam' ভিন্ন ভিন্ন ইমেইলে এই বক্স বা ফোল্ডারটি ভিন্ন নামে থাকে। এই বক্সটি থেকে একটু সাবধানে থাকা প্রয়োজন। প্রতারণা করার জন্য অনেক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কিছু ইমেইল পাঠিয়ে থাকে, যেখানে অর্থ, লটারি বা লোভনীয় কোনো পণ্যের লোভ দেখায়। এই ধরনের ইমেইল এখানে এসে জমা হয়। তাই এই ইমেইলগুলোর কোনো উত্তর বা প্রপ্তিক্রিয়া দিতে হয় না, কোনো লিংক থাকলে সে লিংককেও ক্লিক করা যাবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত আমি নিশ্চিত না হব যে ইমেইল পাঠিয়েছে, তাকে চিহ্নিত করা যাচ্ছে এবং তার উদ্দেশ্য কী তা বোঝা যাচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি ইমেইলটি ক্লিক বা 'Reply' দেব না।
5. 'Draft' বক্স আমি কোনো ইমেইল লিখে সেইভ বা জমা করে রাখতে পারি। আমি একটিই ইমেইল লেখার মাঝপথে মনে হলো আমি ইমেইলটি পরে পাঠালে ভালো হয়, তখন আমি এটিকে ড্রাফট বক্সে রেখে দিতে পারি।

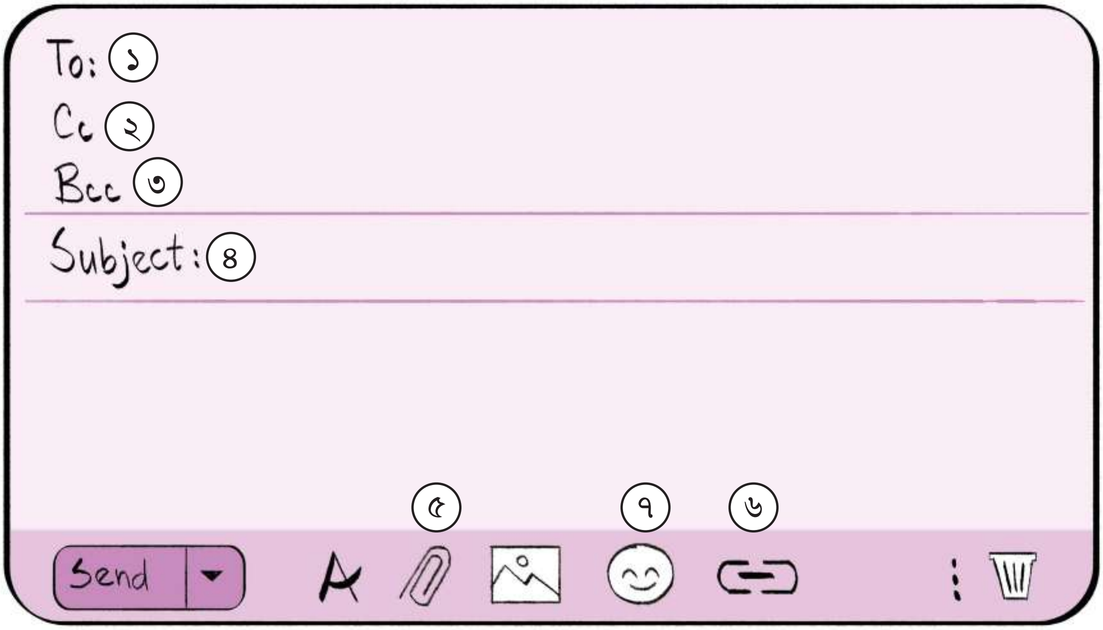

১. 'To' তে আমি যার কাছে ইমেইল করছি তার ঠিকানা লিখতে হবে, তা আমরা ইতোমধ্যে জানি।
২. 'CC' অর্থ হচ্ছে কার্বন কপি। আমি একজনকে ইমেইল করছি সেটি যদি অন্যজনকে অবহিত করে রাখতে চাই, তাহলে যাকে অবহিত করে রাখতে চাই তার ঠিকানা 'CC' তে দিব। যেমন — আমি আমার প্রধান শিক্ষকের কাছে ছুটির আবেদন করব, আমি যে আবেদন করছি সেটি আমার শ্রেণি শিক্ষকের জানা প্রয়োজন, তাই আমি তাকে 'CC' তে রাখতে পারি, যেন তিনিও অবহিত থাকেন আমি ছুটির আবেদন করছি। আনুষ্ঠানিক বা ফরমাল যোগাযোগে CC ব্যবহার করা ভালো। একই সঙ্গে অনেকজনকে CC করা যায়।
৩. 'BCC' সাধারণত একসঙ্গে অনেক মানুষকে পাঠালে তখন ব্যবহার করা হয়। এর মূল উদ্দেশ্য আমার একজন প্রাপক অন্য প্রাপকের ইমেইল ঠিকানা জানবে না। ইমেইল ঠিকানাও একটি ব্যক্তি-গত তথ্য। ধরি, আমি আমার বিদ্যালয়ের ১০০ জন শিক্ষার্থীকে একটি ইমেইল করব। ১০০ জনের ইমেইল ঠিকানা TO তে দিলে সবাই সবার ঠিকানা জেনে যাবে, যেটি ঠিক হবেনা, এমন পরিস্থিতিতে আমি ১০০ জনকে BCC তে রাখতে পারি।

৪. 'সাবজেক্ট/বিষয় ' এর কাজ কী আমি লিখি ....

৫. '৫' 'অ্যাটাচমেন্ট'-এর কাজ কী আমি লিখি ....

৬. আমি যদি আমার ইমেইলে কোনো ওয়েবসাইটের ঠিকানা দিতে চাই তাহলে আমার মূল ইমেইলের যে অংশে বা যে শবদটির মধ্যে লিংকটি রাখতে চাই, সে শব্দটি ক্লিক করে উপরের ছবিতে দেখানো ৬ নম্বর প্রতীকটির উপর ক্লিক করব, ক্লিক করলে একটি বক্স আসবে, বক্সে আমি আমার ওয়েবসা-ইটের লিংকটি যোগ (paste) করব।
৭. আমরা সাধারণত বেশি কথা বা অনুভূতি অল্পকথায় প্রকাশ করতে ইমোজি ব্যবহার করি। এখানে

ক্লিক করলে ইমোজি পাওয়া যাবে। তবে দাপ্তরিক যোগাযোগ বা অফিসিয়াল যোগাযোগে ইমোজি ব্যবহার করা খুব একটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।

বাড়ির কাজ নিয়ে আলোচনা:

আমরা বাড়ির কাজ হিসেবে আমার চিহ্নিত সমস্যাটি সমাধানের জন্য কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন আমাদের সহায়তা করতে পারে তা খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছি। আজকে আমরা আমাদের সমস্যা এবং তার সঙ্গে সম্পর্কিত সমাধানের জন্য ব্যক্তি/সংগঠন/প্রতিষ্ঠানের নাম শিক্ষককে জানাব। শিক্ষকের সহায়তায় আমরা ঠিক করব, কোনো সমস্যাটি নিয়ে আমরা ইমেইল যোগাযোগ করতে চাই। সবার মতামতো নিয়ে আমরা যে কোনো একটি সমস্যা নির্ধারণ করব।

আগামী সেশনের প্রস্তুতি

আমরা আমাদের সমস্যা ও আবেদন জানিয়ে আমাদের ইমেইলে কী লিখতে চাই তার একটা খসড়া এখানে লিখব। এখানে যে বিষয়গুলো থাকবে

১. আমার পরিচয় ও ইমেইল লেখার উদ্দেশ্য

২. আমাদের সমস্যার বিস্তারিত

৩. কীভাবে আমার প্রাপক আমাদের এই সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসতে পারেন।

৪. ধন্যবাদ

এ ছাড়া চিত্র – ক থেকে শেখা (প্রাপকের দক্ষতা, জ্ঞান, দৃষ্টিভঙ্গি, সামাজিক রীতিনীতি, সংস্কৃতি) বিষয়গুলো আমরা আমাদের লেখা ইমেইলে কীভাবে কাজে লাগিয়েছি সেটিও লিখব। প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করব। কাগজটি আঠা দিয়ে খালি পৃষ্ঠার সঙ্গে জোড়া লাগাব।

..................আঠা লাগানোর স্থান..................

‘চিত্র ক’ থেকে শেখা উপাদান যেভাবে কাজে লাগিয়েছি:

সেশন ৫ ইমেইল পাঠানোর সময় হলো

অবশেষে আজকে আমাদের ইমেইল পাঠানোর পালা। আমরা ঠিক করে ফেলেছি আমরা কাকে ইমেইল পাঠাতে চাই এবং ইমেইলের খসড়াও লিখে ফেলেছি। আজকে সবাই মিলে আমরা শ্রেণিকক্ষে বসেই ইমেইলটি লিখব। সবাই মিলে যেহেতু একটি ইমেইল লিখব তাই যেকোনো একজনের ইমেইল ঠিকানা আমরা ব্যবহার করব। আমাদের সবার বয়স যেহেতু এখনও ১৩ বছর হয়নি, অনেকের হয়তো ইমেইল ঠিকানা নেই, তাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে যদি আমরা আমাদের শিক্ষকের ইমেইল ঠিকানা ব্যবহার করি। শিক্ষকের ইমেইল ঠিকানা ব্যবহার করলেও কাজটা কিন্তু আমরাই করব।

প্রথমে আমরা একটি কাগজে (বই-এর পরবর্তী পৃষ্ঠাই) ইমেইলের মূল বক্তব্যটি লিখব। আমরা আমাদের বাড়ির কাজ এর খসড়া ইমেইল থেকে লেখাগুলো নিয়ে এটি করতে পারি। এক্ষেত্রে শিক্ষকের সহায়তায় একজন ক্লাসের সামনে গিয়ে লেখার দায়িত্বটি নেবে, বাকি সবাই তাকে সাহায্য করবে। অর্থাৎ কী লিখতে হবে তা বাকিরা একটি একটি বাক্য করে প্রস্তাব করবে। (লক্ষ্য রাখবে শ্রেণিকক্ষে যেন হইচই না হয়)। যে বাক্যটি ঠিক হচ্ছে, অর্থাৎ সামনের শিক্ষার্থী যা লিখছে তা আমি নিজেও নিজের বইতে লিখব।

লেখা শেষ হলে, আমরা এবার পুরো লেখাটি কম্পিউটার ব্যবহার করে শ্রেণিকক্ষে লিখব। আমরা যাকে ইমেইলটি করব আমাদের শিক্ষক ইতিমধ্যে সেই প্রাপকের ইমেইল ঠিকানাটি জোগাড় করেছেন। শিক্ষক কম্পিউটার খুলে তার নিজের ইমেইল ঠিকানাটি খুলে দেবেন, এরপর 'New Email/ Compose'-এ ক্লিক করলে একটি নতুন বক্স আসবে। এরপর থেকে আমাদের কাজ, আমরা ইমেইলটি লিখব। শ্রেণিকক্ষের সবাই ২/৩ টি করে লাইন লেখার চেষ্টা করব। শ্রেণিকক্ষের সবাই যদি বাংলা টাইপ করতে না পারি, তাহলে যে পারে তার সহায়তায় আমরা অন্তত ২/৩ টি করে শব্দ হলেও লিখব।

যদি শ্রেণিকক্ষের কেউই বাংলা টাইপ করতে না পারে, তাহলে পরবর্তী পৃষ্ঠায় যে ইমেইলটি লেখা হয়েছে শিক্ষক সেটির ছবি তুলে দেবেন। সেই ছবি আমাদের ইমেইলের 'অ্যাটাচমেন্ট' আকারে পাঠাব। এক্ষেত্রে ইমেইল বডি বা মূল অংশের জায়গায় আমরা ইংরেজিতে সংক্ষেপে আমাদের পরিচয় লিখে অ্যাটাচমেন্ট দেখার অনুরোধ করব।

ইমেইল:

To:

CC:

Subject:

*** যদি বিদ্যালয়ে ইন্টারনেট সুবিধা না থাকে তাহলে মন খারাপ করার কিছু নেই। আমাদের শিক্ষক আমাদের লেখা ইমেইলটি চিঠির আকারে ডাকঘরে পৌছানোর ব্যবস্থা করবেন। এ ক্ষেত্রে ইমেলটি কাগজে লেখা হয়ে গেলে আমরা খামে কীভাবে প্রাপক ও প্রেরকের ঠিকানা লিখতে হয় তা জেনে একটি খামে তা লিখব। আমাদের এবং আমাদের প্রাপকের পোস্ট কোড কত তা আমরা শিক্ষকের কাছে জেনে নেব।

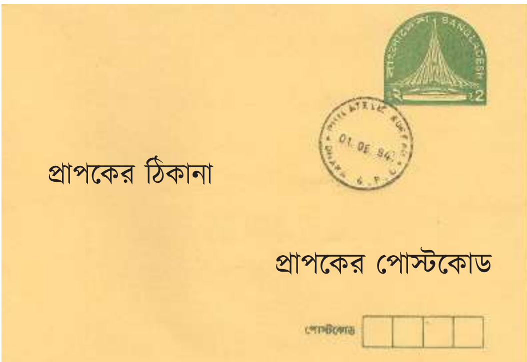

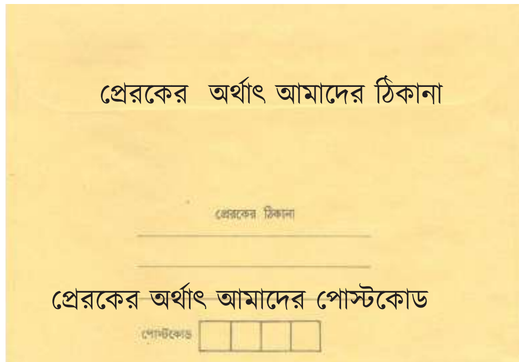

অভিভাবকের কাছ থেকে তারকা সংগ্রহ

একজন সুনাগরিক হিসেবে আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করেছি। আমাদের সমস্যা ও সমাধান চেয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানিয়েছি। আমাদের এই কাজ সম্পর্কে আমাদের অভিভাবক জানলে নিশ্চয়ই অনেক খুশি হবেন। আমাদের ইমেইল/ চিঠিটি বাসায় গিয়ে আমার অভিভাবককে পড়ে শোনাব। আমার অভিভাবক বলবেন আমাদের লেখাটি কেমন হয়েছে। অভিভাবক তার পছন্দ অনুযায়ী ১টি থেকে ৫টি তারা আমাদের রং করে দিতে পারেন। ১টি অর্থ অল্প পছন্দ, ৫টি অর্থ অনেক বেশি পছন্দ।

অভিভাবকের স্বাক্ষর:

শিখন অভিজ্ঞতা ৯

আঞ্চলিক বৈচিত্র্যপত্র

সেশন ১ বৈচিত্রের সৌন্দর্য্য

বৈচিত্র্য বলতে আমি বুঝি বিভিন্নতা। ষষ্ঠ শ্রেণিতে আমরা বাংলাদেশের আটটি বিভাগ সম্পর্কে জেনে একটি স্থানীয় বৈচিত্র্যপত্র অর্জন করেছিলাম। এবার আমরা একটি আঞ্চলিক বৈচিত্র্যপত্র অর্জন করার লক্ষ্যে কাজ করব। অঞ্চল বলতে আমরা বুঝি একটি নির্দিষ্ট এলাকা বা কোনো স্থানের নির্দিষ্ট পরিধি। এটি অনেক ছোট হতে পারে আবার অনেক বড়ও হতে পারে। যেমন, একটি গ্রামের যেমন নির্দিষ্ট অঞ্চল হয়, তেমনি বিশ্বেরও নির্দিষ্ট অঞ্চল হতে পারে। আমরা এবার বিশ্বের একটি অঞ্চল—দক্ষিণ এশিয়া সম্পর্কে জানার চেষ্টা করব এবং সফলভাবে জানতে পারলে আমরা একটি আঞ্চলিক বৈচিত্র্যপত্র অর্জন করতে পারব। এ ছাড়াও বৈচিত্র্যপত্র অনুমোদন দেওয়ার জন্য আমাদের শিক্ষক এই বইয়ের শুরু থেকে আমরা যে যে প্রকল্প করেছি, সবগুলোর মূল্যায়নে গুরুত্ব দেবেন।

নিচে দক্ষিণ এশিয়ার একটি মানচিত্র দেওয়া হলো। মানচিত্রটি দেখে কি আমরা বলতে পারি কোনোটি কোনো দেশ?

দেশের মানচিত্রের পাশে পাশে দেশগুলোর নাম লিখি—

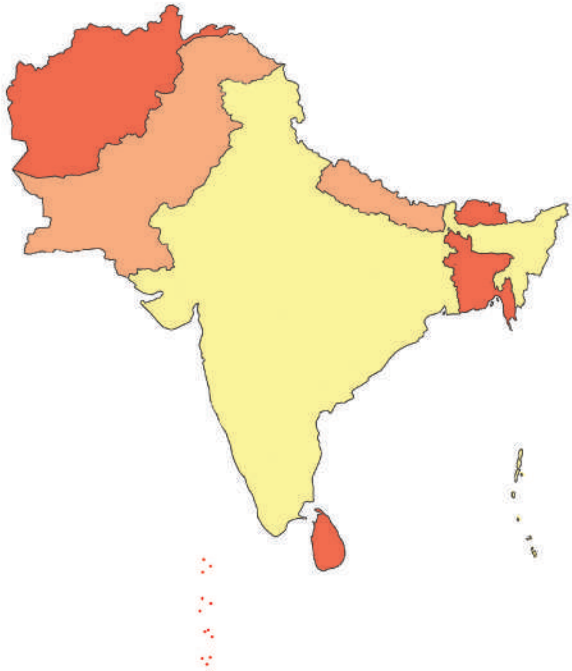

মানুষের মধ্যে যেমন মিল রয়েছে, তেমনি রয়েছে কিছু অমিল। জন্মগতভাবে মানুষ কিছু মৌলিক ভিন্নতা নিয়ে জন্মায়, যেমন গায়ের রং, দেহের আকৃতি, চেহারার ভিন্নতা। আমারা একসঙ্গে বা আলাদা ভাবে বড় হওয়ার কারণে মানুষের আচার-আচরণে কিছু মিল ও অমিল তৈরি হয়। যেমন আমাদের দেশের মধ্যেই এক এক জেলার মানুষ ভিন্ন ভিন্নভাবে বাংলায় কথা বলে, আবার বিভিন্ন নৃগোষ্ঠী ভিন্ন ভাষায় কথা বলে; কিন্তু যখন আমরা দেশকে নিয়ে কিছু চিন্তা করি, তখন আবার সবাই প্রায় একই রকম করে দেশকে ভালোবেসে চিন্তা করি।

আমি দশ বছর পর বাংলাদেশে যে পরিবর্তন দেখতে চাই তা এক বাক্যে নিচে লিখি:

উপরের লাইনে আমার এবং আমার বন্ধুর বাংলাদেশ নিয়ে ভাবনা মিলিয়ে দেখলে দেখব আমরা অনেকে একই রকম ভাবনা লিখেছি, আবার অনেকে ভিন্ন কিছু লিখেছে। বিভিন্ন কারণে আমাদের আচরণ ও চিন্তাভাবনার মধ্যে ভিন্নতা তৈরি হতে পারে। মনে করি, ১০০ বছর আগের একজন মানুষ যে বাংলাদেশের যে অঞ্চলে আমি এখন বসবাস করছি, সে অঞ্চলে ১০০ বছর আগে বসবাস করতেন।

আমি এবং সে ১০০ বছর আগের একজন মানুষ, আমরা দুজন একই জায়গায় বসবাস করেও আমাদের আচরণ ও চিন্তাভাবনার মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। এই পার্থক্যগুলো কী হতে পারে বলতে পারো?

(এই ঘরে আমার মুখের অবয়ব আঁকি)	(১০০ বছর আগের একজন মানুষের মুখের অবয়ব আঁকি)
১. আমি বিদ্যুতের আলো ব্যবহার করে রাতে পড়তে বসি ২. আমি মোটরচালিত গাড়িতে চড়ি ৩. ৪. ৫.	১. তার সময়ে বিদ্যুৎ ছিল না ২. তিনি হয়তো গরুর গাড়িতে চড়তেন ৩. ৪. ৫.

আগামী সেশনের প্রস্তুতি

উপরের খালি জায়গায় আমার আর ১০০ বছর আগের মানুষের মধ্যে কী কী পার্থক্য আছে বলে মনে হয় তা লিখব। পার্থক্যগুলো লেখার সময় লক্ষ্য রাখব সেগুলো যেন আচরণ ও চিন্তা-ভাবনার মধ্যে পার্থক্য হয়। তার এবং আমার বাহ্যিক রুপ (দেখতে কেমন) নিয়ে পার্থক্য লিখতে হবেনা।

সেশন -২ প্রযুক্তির পরিবর্তন

প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে মানুষ তার প্রতিদিনের জীবন যাপন অনেক সহজ করছে, আরও উন্নত করছে। গত দিনের বাড়ির কাজ করতে গিয়ে আমরা কী একটি জিনিস কি লক্ষ্য করেছি যে, আমার আর ১০০ বছর আগের একজন মানুষের মধ্যে যে পার্থক্যগুলো রয়েছে, তার অধিকাংশই প্রযুক্তির পরিবর্তনের

কারণেই হয়েছে?

আরেকটি ব্যাপার লক্ষ্য করলে বুঝতে পারব, আমাদের দুজনের মধ্যে যে পরিবর্তনগুলো আমি দেখতে পেলাম সেগুলো অনেকাংশে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন। । সামাজিক পরিবর্তন হলো, সমাজ কাঠামোর পরিবর্তন এবং সাংস্কৃতিক পরিবর্তন হলো মানুষের জীবন আচরণের পরিবর্তন।

যেমন, একসময় সবাই হাতে চালানো তাঁতের তৈরি পোশাক পরতো। হাতে চালানো তাঁতে কাপড় তৈরি করতে অনেক সময়ের প্রয়োজন হয়, যার কারণে এর দামও অনেক বেশি ছিল। যখন সুতা ও কাপড় তৈরির প্রযুক্তি আবিষ্কার ও ব্যবহার শুরু হলো, তখন অল্প সময়ে অনেক বেশি কাপড় উৎপাদন সম্ভব হয়ে গেল। মানুষও অনেক অল্প খরচে কাপড় কিনতে শুরু করল আর সুতির কাপড় ছাড়াও তারা সিনথেটিক (নাইলন, পলিয়েস্টার) কাপড়ের নানান রং ও ডিজাইনের কাপড় পরতে শুরু করল। পোশাক পরিধানের ক্ষেত্রে মানুষের আচরণের এই পরিবর্তন প্রযুক্তির পরিবর্তনের সঙ্গে সম্পর্কিত।

এক সময় ভারতীয় উপমহাদেশে ধুতি বা লুঙ্গিজাতীয় পেশাকই ছিল পুরুষদের প্রধান পোশাক। ইংরেজরা এই অঞ্চল যখন শাসন করে, তখন তারা এখানকার পুরুষদের তাদের পোশাক 'প্যান্ট' পরতে উৎসাহী করে বা কখনো কখনো বাধ্য করে। একসময় এই প্যান্টই হয়ে যায় পুরুষদের জন্য আনুষ্ঠানিক পোশাক। আমরা এখন কাউকে ধুতি বা লুঙ্গি পরে স্কুল বা অফিসে যেতে দেখিনা। মানুষের ভিন্ন ধরনের পোশাক পরার এই পরিবর্তন প্রযুক্তির চেয়েও রাজনৈতিক এবং শাসনপ্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত।

কিছু কিছু প্রযুক্তিগত পরিবর্তন আমাদের জীবনাচরণের মধ্যে এমন ভিন্নতা বা নতুনত্ব নিয়ে আসে যা আমাদের চমকে দেয়। অনেকে এই পরিবর্তন সহজে মেনে নিতে পারে না; আবার অনেকে পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়।

নিচে কিছু পরিবর্তন দেওয়া হলো। কিছু পরিবর্তন তুমি নিজের কল্পনাশক্তি কাজে লাগিয়ে চিন্তা করে লিখবে যে ভবিষ্যতে কী বা কেমন পরিবর্তন আমাদের জীবনে আসতে পারে ।

আর পাশের দুই ঘরের মধ্যে এক ঘরে তুমি ওই পরিবর্তন সম্পর্কে মতামতো দেবে। তোমার যদি মনে হয় পরিবর্তনটি ইতিবাচক বা ভালো, তাহলে √ আর যদি মনে হয় এটি ভালো পরিবর্তন নয় তাহলে × দেবে। অন্য আরেকটি ঘরে তোমার পরিবারের সবচেয়ে প্রবীণ সদস্য যেমন দাদা-দাদি, নানা-নানি তাদের মতামতো নিয়ে তুমি টিক √ বা ক্রস × দেবে। বাড়িতে গিয়ে 'পরিবারের প্রবীণ সদস্যের মতামত'গুলো তোমরা জেনে √ বা × দিয়ে সর্বডানের ঘরটি পূরণ করবে।

সারণি ৯.১

পরিবর্তন	আমার মতামত	পরিবারের প্রবীন সদস্যের মতামত
১. বাজার থেকে মাছ বা ফলমূল কিনতে প্লাস্টিক ব্যাগের ব্যবহার		
২. পড়াশোনা বুঝতে ইন্টারনেটের ব্যবহার		
৩. মঞ্চের পালাগান বা নাটকের পরিবর্তে ইন্টারনেটে বিনোদন নেওয়া		
৪. মাঠে খেলার পরিবর্তে মোবাইল ফোন সেটে ভিডিও গেমস খেলা		
৫. উড়োজাহাজে এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাওয়া		
৬. ইন্টারনেট ব্যবহার করে ভিডিও কলে কথা বলা		
৭. মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে বাজার করা		
৮. ইন্টারনেটে ভিডিও দেখে কোনো রোগের চিকিৎসা করা		
৯.		
১০.		
১১.		
১২.		
১৩.		
১৪.		

আগামী সেশনের প্রস্তুতি

১. উপরের সারণির একেবারে ডান পাশের কলামে তোমার পরিবারের প্রবীণ সদস্যের মতামত নিয়ে √ বা × দেবে।

২. তোমার বাবা-মা বা অভিভাবকের সময় আর তোমার সময়ে জীবনযাপনের মধ্যে কী পার্থক্য তা তাদের সঙ্গে গল্প করে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করবে এবং নিচের খালি জায়গায় লিখবে।

আমার এবং আমার অভিভাবকের সময়ের জীবনযাপনের মধ্যে পার্থক্য:

এই পার্থক্যে কি প্রযুক্তির কোনো ভূমিকা আছে?

থাকলে কী কী?

সেশন -৩ মতামতের পার্থক্য ও যুক্তির খেলা

আমরা গত দিন একটি কাজ করেছিলাম যেখানে কোনো কোনো প্রযুক্তির পরিবর্তন আমার ভালো লাগে আর কোনোগুলো আমার ভালো লাগে না সেই মতামত দিয়েছি। একটু লক্ষ্য করলে বুঝতে পারব আমার মতামত আর আমার বন্ধুর মতামত কিছু কিছু জায়গায় ভিন্ন আবার আমার আর আমার পরিবারের প্রবীণ সদস্যদের মতামতও কিছুটা ভিন্ন।

একটি কাজ করলে কেমন হয়, আমরা গত দিন সারনি ৯.১ এ কিছু পরিবর্তনের কথা বলেছি এবং নিজেদের মতামত দিয়েছি- কোনটি ভালো পরিবর্তন আর কোনোটি নয়। এখন শ্রেণিকক্ষের সকল জোড় রোল/আইডি নাম্বারের সবাই 'নেতিবাচক পক্ষ' এবং বিজোড় নাম্বারের সবাই 'ইতিবাচক পক্ষ' হয়ে দুই দল হয়ে যাবে। (সবাই যার জায়গায় বসে থাকব, স্থান পরিবর্তন করতে হবে না)।

এখন শিক্ষক একটি একটি করে পরিবর্তনের কথা বলবেন। আর জোড় রোল নাম্বারের সবাই একজন করে হাত তুলে ঐ পরিবর্তনটি যে খারাপ পরিবর্তন তা যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করবে। অন্যদিকে বিজোড় রোল নাম্বারের সবাই একজন করে হাত তুলে ঐ পরিবর্তনটি যে ভালো পরিবর্তন তা প্রমাণ করার চেষ্টা করবে।

উদাহরণ:

শিক্ষক: বাজার থেকে মাছ বা ফলমূল কিনতে প্লাস্টিক ব্যাগের ব্যবহার

জোড় রোল নাম্বার: এটি ভালো পরিবর্তন নয়, এতে পরিবেশ দূষিত হয়

বিজোড় রোল নাম্বার: এটি ভালো পরিবর্তন, কারণ এতে আমাদের জীবনে বিভিন্ন উপকার হয়েছে।

যুক্তির খেলা শুরু করার আগে একটি বিষয় জেনে রাখা ভালো: আমরা যখন অন্য দলের বিপক্ষে কথা বলব এর অর্থ হচ্ছে ঐ দল যে বিষয়ে কথা বলছে সে বিষয়ের বিপরীত যুক্তি দিয়ে কথা বলব আমরা

একে অন্যকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করব না।

আমাদের মধ্যে অনেক সময়ে বিভিন্ন মতবিরোধ তৈরি হতে পারে, একজনের পছন্দ বা মতামত আমার অপছন্দ হতে পারে, আমরা যখন নিজের মতামতকে সঠিক প্রমাণ করার জন্য অন্যকে নীচু করে কথা বলি, তখন এটিকে বলে ঘৃনা ছড়ানো। আমাদের সাধারণ জীবনে এটি অনেকে করে থাকেন, আবার ইন্টারনেট ব্যবহার করেও এটি অনেকে করে থাকেন। ইন্টারনেট ব্যবহার করে ঘৃণা ছড়ানো কথা বললে সেটির ভয়াবহতা আরও অনেক গুণ বেড়ে যায়।

তাই আমরা আমাদের যুক্তি-তর্কের সময় লক্ষ্য রাখব, যুক্তি দিয়ে এবং তথ্য দিয়ে আমাদের মতামত প্রতিষ্ঠা করার বা সত্য প্রমাণ করার চেষ্টা করব। অন্যকে ব্যক্তিগত আক্রমণ বা মুখের কথায় আঘাত করে নয়।

.... যুক্তির খেলা ....

যুক্তির খেলায় আমি হাত তুলে শিক্ষকের বলা পরিবর্তন গুলো সম্পর্কে যে যে যুক্তি দিয়েছিঃ
১.
২.
৩.

দলগঠন: আমাদের কথা ছিল আমরা একটি দক্ষিণ এশিয়া মেলার আয়োজন করব। এখন শিক্ষক আমাদের ৭টি দলে ভাগ করে দেবেন। প্রতিটি দলকে শিক্ষক একটি করে দক্ষিণ এশিয়ার দেশ বাছাই করে দেবেন। আমাদের কাজ হবে প্রযুক্তির পরিবর্তনের ফলে ওই দেশে কী পরিবর্তন হয়েছে যেটি পৃথিবীর অন্যান্য স্বল্পোন্নত দেশ তাদের কাছে শিক্ষা নিতে পারে,' তা খুঁজে বের করা। আমরা আজ থেকে আমার দল যে দেশ নিয়ে কাজ করবে, সে দেশ সম্পর্কে তথ্য অনুসন্ধান করা শুরু করব।

নিচের তালিকা থেকে যেকোনো একটি পরিবর্তনের উপর গুরুত্ব দেব:

১. শিক্ষা ক্ষেত্রে পরিবর্তন

২. চিকিৎসা ক্ষেত্রে পরিবর্তন

৩. বিনোদনে পরিবর্তন

৪. পরিবেশ ও জলবায়ূর ভারসাম্য রক্ষায় পরিবর্তন

৫. কর্মসংস্থানে পরিবর্তন

সেশন - ৪ তথ্য খুঁজে প্রোফাইল তৈরি

আজকের সেশন আমরা শুধু তথ্য অনুসন্ধানের জন্য কাজে লাগাব এবং দলের সবাই মিলে আগামী দিনের উপস্থাপনার জন্য কে কোন অংশের কাজ করব সেটি নির্ধারণ করে নেব।

তথ্য অনুসন্ধানের উৎস হতে পারে:

১. বিদ্যালয়ের লাইব্রেরী

২ পত্রিকা/বই/ম্যাগাজিন

৩. ইন্টারনেট

৪. আমার আশপাশের এমন কোনো ব্যক্তি যিনি সমসাময়িক বিষয় নিয়ে খবর রাখেন।

৫. আমার বিদ্যালয়ের কোনো শিক্ষক।

আগামী দিনের মেলার প্রস্তুতি আমরা শ্রেণিকক্ষের ভেতর কিংবা বাইরে নিজেদের দলের জন্য একটি বুথ বানাব (অনেকটা বিজ্ঞান মেলার বুথের মতো)। বুথে দাঁড়িয়ে আমরা আমাদের উপস্থাপনা করব। বুথ সাজানো এবং উপস্থাপনার জন্য কনটেন্ট তৈরি করার জন্য মেলার আগেই সকল প্রস্তুতি শেষ করতে হবে। এ ছাড়া আমরা মেলায় বিভিন্ন দেশ সম্পর্কে কী জানলাম তা লেখার জন্য নিজেদের জন্য একটি ডায়েরি বানাব।

সেশন –৫ দক্ষিণ এশিয়া মেলা

আজ আমরা শুধু উপস্থাপন করব। দলের প্রতিটি সদস্য নিজেদের স্টল/বুথের সামনে ১০-১৫ মিনিট (সদস্যের সংখ্যার উপর নির্ভর করবে) করে থাকব, বাকি সদস্যরা ঘুরে ঘুরে অন্য বুথে গিয়ে বিভিন্ন দেশ সম্পর্কে জানবে এবং ঐ দেশ সম্পর্কে ডায়েরিতে লিখবে। উপস্থাপনকারী সদস্য স্টলে দাঁড়িয়ে থাকবে, অন্য দলের সবাই এসে তাকে প্রশ্ন করে করে ওই দেশ সম্পর্কে জেনে নেবে এবং একটি খাতায় নোট রাখবে।

আজকের উপস্থাপন শেষ হলে, আমরা বাড়ি গিয়ে বিভিন্ন দেশ সম্পর্কে ডায়েরিতে আমার নিজের পর্যবেক্ষণগুলো লিখব। এর পরদিন এসে এই ডায়েরিটা এবং আমাদের 'ডিজিটাল প্রযুক্তি' শিক্ষকের কাছে জমা দেব। শিক্ষক আমাদের ডায়েরি মূল্যায়ন করে আমাদের জন্য 'আঞ্চলিক বৈচিত্র্যপত্র' প্রস্তাব করবেন এবং প্রধান শিক্ষক আমরা যারা আঞ্চলিক বৈচিত্র্যপত্র পাওয়ার যোগ্য, তাদের জন্য বৈচিত্র্যপত্র স্বাক্ষর করবেন। শিক্ষক আবার আমাদের বইটি ফেরত দেবেন, তখন আমরা আমাদের বৈচিত্র্যপত্রটি কেটে নিজেদের কাছে সংরক্ষণ করব।

আমাদের ডায়েরিতে যা থাকবে: (মেলায় পাওয়া বিভিন্ন দলের

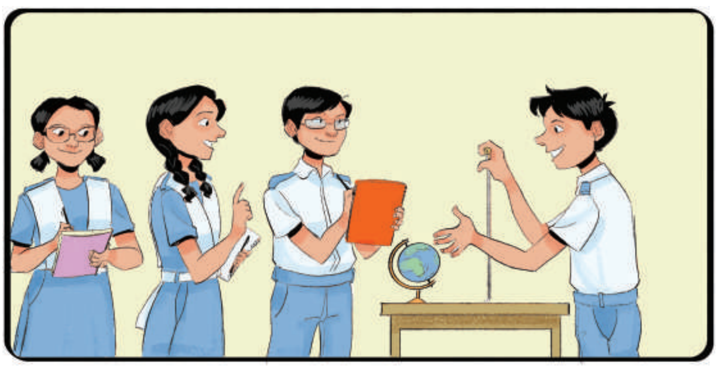

তথ্যের ওপর ভিত্তি করে ডায়েরিটি লিখতে হবে)

১ . দেশের নাম (৭টি দেশ সম্পর্কে আলাদা আলাদা লিখতে হবে);

২. উপস্থাপন থেকে যে পরিবর্তন সম্পর্কে জানলাম;

৩. পরিবর্তনটি সম্পর্কে আমার অনুভূতি;

৪. অন্য কোনো দেশ এই পরিবর্তন থেকে যা শিখতে পারে বলে আমি মনে করি—

....(নাম)

.... টি দেশ সম্পর্কে যথাযথ তথ্য উপস্থাপন ও নিজের পর্যবেক্ষণ উপস্থাপন করতে পেরেছে। আমি তার প্রাণবন্ত ও বৈচিত্র্যপূর্ণ ভবিষ্যৎ কামনা করি ।

শিক্ষকের স্বাক্ষর

প্রধান শিক্ষকের স্বাক্ষর

৬২

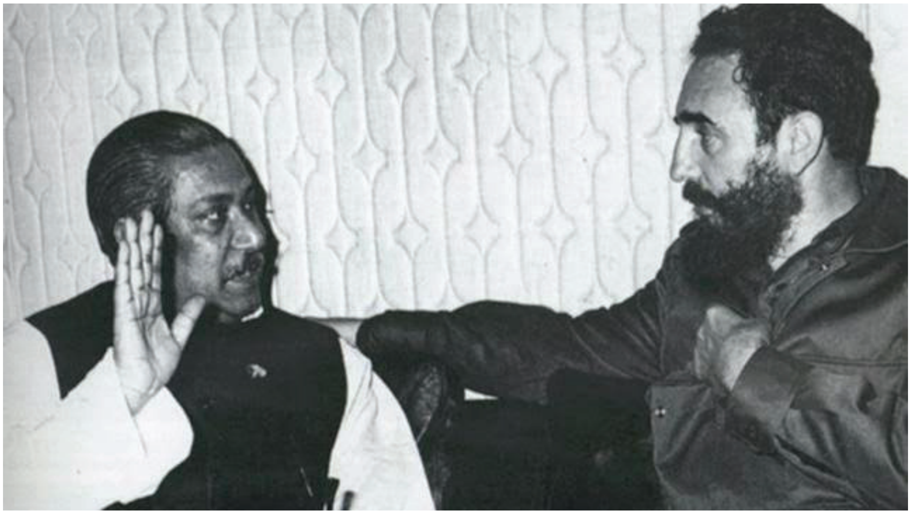

১৯৭৩ সালে আলজেরিয়ায় অনুষ্ঠিত জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের (ন্যাম) চতুর্থ সম্মেলনে
কিউবার বিপ্লবী নেতা ফিদেল ক্যাস্ট্রোর সাথে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

"আমি হিমালয় দেখিনি
কিন্তু শেখ মুজিবকে দেখেছি,
ব্যক্তিত্ব এবং সাহসিকতায়
তিনিই হিমালয়"
– ফিদেল ক্যাস্ট্রো

২০২৩ শিক্ষাবর্ষ

দাখিল

সপ্তম শ্রেণি

ডিজিটাল প্রযুক্তি

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে হলে নতুন প্রজন্মকে প্রস্তুত হতে হবে

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য "৩৩৩" কলসেন্টারে ফোন করুন

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকারের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে ১০৯ নম্বর এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘন্টা সার্ভিস) ফোন করুন

শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ শেখ হাসিনার বাংলাদেশ

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য